কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্র-পরিষদ
সম্পাদিত

১৯৪২

কান্ত পাব্‌লিশিং হাউস্‌
১ডি, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

১ডি, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কান্ত পাব্লিশিং এর পক্ষ হইতে
শ্রীসতীকান্ত গুহ বি, এ, প্রকাশিত।

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রজন্মোৎসব আসন্ন, সেই সময়ে কবি-পরিচিতির মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। কান্তিকযন্ত্রের কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত তৎপরতার সহিত মাত্র ক'টি দিবসে পুস্তকখানা সুষ্ঠুরূপে মুদ্রিত করিয়া দেন।

সময় সংক্ষেপ বলিয়া শ্রদ্ধেয় লেখকলেখিকাগণ স্ব স্ব রচনা সংশোধনের সুযোগ পান নাই। সেই কারণে এবং দ্রুত মুদ্রণহেতু দুচারিটি অসঙ্গতি রহিয়া গেছে। যেমন শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের রচনার একস্থলে "বোতল-বদ্ধ" কথাটী রূপান্তরিত হইয়া "কলসীর মধ্যে আবদ্ধ" হইয়া গেছে (পৃঃ ১০১ ছত্র ৭); শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনায় 'নাছোড়' 'নাছোড়' হইয়া গেছে। এই সংকীর্ণ সময়ে যতটা সম্ভব মুদ্রণ ততটা নির্ভুল হইয়াছে। দৈবক্রমে বিশেষ সুযোগ ঘটায় কবি স্বয়ং তাঁহার কবিতার প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত পরিষদের সভাপতি ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া বহু কূট সমস্যার সমাধান করিয়া আমাদের শ্রমলাঘব করিয়াছেন।

নিতান্ত অসুস্থাবস্থায় তরুণশিল্পী শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রচ্ছদ-পরিকল্পনার রেখাঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্লকব্যবসায়ী "দি ইণ্ডিয়ান্ ফটো এনগ্রেভিং কোং" অতি অল্পসময়ে বহু অসুবিধা ভোগ করিয়া প্রচ্ছদচিত্র ও কবির প্রতিকৃতির ব্লক নির্ম্মাণ ও মুদ্রণ সমাধা করিয়া দিয়াছেন।

কান্তপ্রকাশালয়ের উপদেষ্টা শ্রীউষাকান্ত ও শচীকান্ত গুহ পুস্তকের শেষাংশ মুদ্রণের সময় আমাকে উপদেশদানে বাধিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মূল্য দুই টাকা।

৩৪, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
কান্তিকযন্ত্রে—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মুদ্রিত।

সপ্ততিতম রবীন্দ্রজন্মতিথি

ভূমিকা

আর কয়েক মাস পরে রবীন্দ্র পরিষদ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিবে। ১৯২৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় উৎসাহী ছাত্রের চেষ্টায় এই সঙ্ঘ প্রথম স্থাপিত হয়। তাহাদেরই উদ্যমে আজও ইহা চালিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী যে, সভাটী যে এই কয় বৎসর টিকিয়া আছে ইহাতেই আমাদের মধ্যে অনেকে আত্মশ্লাঘা ও আত্মসন্তোষ অনুভব করেন। এই কয় বৎসরে সভাটী যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে একথা বোধহয় বলা চলে না। তবে, ক্রমশঃ যে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই একথা বোধহয় বলা চলে। পরিষদের সভ্যেরা যদি আরও বেশী উৎসাহ-ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে হয়ত সভ্যসংখ্যা আরও বাড়াইতে পারা যাইত। ইহার জ্যোতিচ্ছটা আরও একটু ছড়াইয়া পড়িতে পারিত এবং ইহার যথার্থ উদ্দেশ্য আরও একটু সফল হইতে পারিত। অবশ্য সভ্যসংখ্যা বাড়িলেই যে রবীন্দ্র পরিষদের কাজ অধিকতর সুসম্পন্ন হইত তাহা বলা যায় না, বরং পক্ষান্তরে হয়ত একথা বলা যায় যে সভ্যসংখ্যা কম থাকিয়াও যদি সমজদার লোক থাকেন তাহা হইলে এ পরিষদের কাজ যথার্থ ভাবে চলিতে পারে। আজ কাল অনেকেই বেদান্ত পড়েন বটে কিন্তু কেহই বেদান্তী হ'ন না। বেদান্ত পড়া যাকে তাকে সাজে না; শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিলে তবে সে বেদান্ত পড়িবার যথার্থ অধিকারী হইতে পারে। সাহিত্যমাত্রেই সেইরূপ একটী অধিকারী-নির্ণয় আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে। অনেকে সাহিত্য পড়িতেই চান না, অনেকে পড়িলেও রস পান না, অনেকে রস পাইলেও যেখানে তাহার যথার্থ সূতার ও চমৎকারিত্ব তাহা ধরিতে পারেন

না। এম্‌, এ, পি, এইচ, ডি প্রভৃতি উপাধি মালায় বিভূষিত হইয়াও, এমন কি আজীবন সাহিত্য অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়াও কেহ হয়ত সাহিত্যরসিক নাও হইতে পারেন; আবার একেবারে নিরক্ষর হইয়াও কেহ হয়ত সাহিত্যের যথার্থ সমজদার হইতে পারেন। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কথা, ইহা লইয়া বিবাদ করা চলিতে পারে, ইহাতে অভিমান, অসন্তোষ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ইহার অন্যথা করা যায় না। সাহিত্যরসে কাহারও জন্মগত অধিকার, কেহ বা উহাতে জন্ম হইতেই বঞ্চিত। আমাদের পঠদ্দশায় দেখিয়াছি যে কবি হিসাবে হেম, নবীন বড় কি রবীন্দ্রনাথ বড় এ সম্বন্ধে আমাদের সতীর্থদের মধ্যে যদি ভোট লওয়া যাইত তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এত কম ভোট হইত যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবিই নন্ এই কথাটাই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আজকাল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে মতভেদ অনেক কম। কিন্তু তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে বাংলা দেশে রবীন্দ্রকাব্যের রসজ্ঞতা সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্তিতে ও পৃথিবীতে তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যাঁহাদের ভাল লাগে না তাঁহারাও জোরগলায় তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিতে সাহস পান না। কিন্তু তাঁহার কাব্য দেশের নানা জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির কোনও আনুকূল্য করে না এরূপ কথা আমরা মধ্যে মধ্যে যে শুনিতে পাই না এমন নহে। বিভিন্ন জাতীয় কাব্যের রসগ্রহণে ক্ষমতার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমাদের প্রত্যেকের অন্তর ধাতুর এমন এক একটি বিশিষ্টতা বা বৈচিত্র্য আছে যে সেই সেই বিশিষ্ট চিত্তপটের উপর কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ রকমের ছবিই রঙে ফুটিয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইতে পারে। অন্য জাতীয় ছবি হয়ত সেখানে ফুটিতেই পারে না। যাহার চিত্ত দাশুরায়ের পাঁচালীতে একান্ত

মুগ্ধ হইয়া ওঠে সে হয়ত গীতাঞ্জলি উল্টাইয়াও দেখিতে চায় না। সর্ব্বজনসাধারণ অত্যন্ত স্থূল ভাবকে অবলম্বন করিয়া শব্দ ঝঙ্কারের সাহায্যে যাঁহাদের কাব্য রসমধুর হইয়া ওঠে তাঁহারা সহজেই গণচিত্তকে দখল করিয়া বসিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের কাব্য আমাদের চিত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দ্দার অতি পেলব রসকম্পনের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কাব্য বুঝিবার জন্য বিশিষ্ট জাতি ও সমজদারের আবশ্যক হয়। গ্রাম্যলোকের চক্ষুতে রবিবর্ম্মার রঙ্‌চঙে ছবি ব্যাথোল বা ভিঞ্চির ছবি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হইতে পারে; মোজার্ট বা বিঠোভেনের সঙ্গীত আমাদের দেশের সাধারণ শ্রোতার কাণে হয়ত কেবলমাত্র গণ্ডগোল বলিয়াই মনে হইবে। এইজন্য সাহিত্য, চিত্রকলা বা সঙ্গীত বিদ্যার রাজ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট রসজ্ঞতার আভিজাত্য স্বীকার করিতেই হইবে। গণতন্ত্রতার মূঢ়তায় ইহাকে আচ্ছন্ন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বকালের লিরিক কবিদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ। আমাদের হৃদয়ে অনেক অনাবিষ্কৃত গুপ্ত তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া তিনি যে রসমাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরের রসদৃষ্টির বিশেষ প্রস্ফুরণ না হইলে তাহা আস্বাদন করা সহজ নহে। এইজন্য দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝে এবং রবীন্দ্রনাথকে বোঝে না এই দুইটি দুই বিভিন্ন জাতি। আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে যদিও বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাইশ তেইশখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—তথাপি বাংলা ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুই একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তক ছাড়া কিছুই লেখা হয় নাই। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কবিতায়, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে যে বিপুল সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী যে ভাষা ব্যবহার করেন, তরুণ কবিরা যে ছন্দ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, মধ্যবয়স্ক বাঙালী যে উচ্চ অঙ্গের চিন্তা-

ধারায় পরস্পর ভাব বিনিময় করেন তাহার প্রায় অধিকাংশই তাঁহার দান। অথচ তাহা এত অলক্ষিতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি যে বিশেষ অনুধাবন না করিলে তাহা আমাদের চোখেই পড়ে না। শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে তাঁহার সাহিত্য আলোচনা অপেক্ষা সহজ আত্মোৎকর্ষের উপায় অতি অল্পই আছে। বাংলাদেশের নানাস্থানে অনেক রবীন্দ্রপরিষদ স্থাপিত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরিয়া নানা আলোচনা হইয়া নানা গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত ছিল। শুনিতে পাই যে দু এক স্থানে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কালে দু একটী রবীন্দ্রপরিষদ গঠিতও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনটীও বৎসরাধিক বাঁচিতে পারে নাই। রবীন্দ্র পরিষদে ক্রমশঃ যদি ...বাধ রবীন্দ্র রসজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহারা সংহত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন তবে এই পরিষদস্থাপন সার্থক হয়। এই পরিষদে প্রতিপক্ষে যে সমস্ত বক্তৃতা হইয়াছে ও প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে তাহা একত্র করিলে বহুশত পৃষ্ঠা পূর্ণ হইত। কিন্তু মৌখিক বক্তৃতাগুলি সমস্তই প্রায় উড়িয়া গিয়াছে এবং লিখিত বক্তৃতারও সব কটি একত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শ্রীরবীন্দ্রনাথের শুভ সপ্ততিতম জন্মবাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে কয়েকটী মাত্র প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইল। শ্রদ্ধেয় প্রকাশকদিগের সৌজন্য ও ঔদার্য্য বিনা ইহা সম্ভব হইত না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। রবীন্দ্রপরিষদে পঠিত প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া যাঁহারা এই গ্রন্থসঙ্কলন সম্ভব করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কবি স্বয়ং এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া ও একটী রসোজ্জ্বল কবিতা দিয়া ইহার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এই শুভ জন্মবাসরে আমাদের পরম আত্মীয় পরম প্রিয় পরম পূজনীয় সর্ব্বকালের এই বিশ্ববরেণ্য কবিকে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া প্রণাম করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যূষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিল হিল্লোল দোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ-ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হোলো অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপন বীণার তন্তুজালে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তা'রে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্চ্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তা'রে দিনু উৎসারিয়া

এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তা'রে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি'
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরী কলস্বনা।
চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কল রল-রোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অন্তরের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি
এই গীতি পথপ্রান্তে। হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ;—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পরিষদে কবির অভ্যর্থনা পূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহি[illegible] সে বাণীমূর্ত্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সঙ্কীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বল্‌তে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু এরা উভয়েই যে একদলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে-কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চল্‌বে কেন?

নাটকসৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝ'রে প'ড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন,—সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেচেন, "মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইনি না থাক্‌লে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জ'মে উঠে' যেটি চিরকালের

---

* প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের অভ্যর্থনার উত্তরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের মৌখিক অভিভাষণের ছাত্রগণগৃহীত বস্তুসংগ্রহ হইতে কবির স্বকৃত লিখিতানুবৃত্তি।

তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল, যেটা স্থাবর সেটাকে ঠেলে ফেল্‌বার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠ ২।৩।৩

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে' এর মিল আছে বই কি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন, কিন্তু কবি আসেন "পঞ্চমঃ"; আশুপ্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্চে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে-সঙ্গীতে-নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু না কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেচে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেম্‌নি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা কর্‌তে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক

মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর এক জন। এই ব্যাখ্যাকর্ত্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কি কথাটি বলচে, সেটি শোন্‌বার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে—যাঁরা শুন্‌তে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোন্‌বার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না—তাদের কানে সুরগুলো পৌছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধর্‌তে পারে না। কাব্যসম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব [illegible]করই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়,—সন্দেশের মধ্যে তারা খাদ্যকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্যে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চ্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্ব্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার একদিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি আর একদিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই, এই যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েচে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েচেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু না কিছু শুন্‌তে পেয়েচেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানাদিক্ থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড় সুযোগ, পাঠকের

শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টিপদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনো প্রভাতে-সন্ধ্যায় ঋতুতে-ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ কর্‌তে না পার্‌লে সে জান্‌তেও পারে না যে, সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেচে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেচেন, দীপ জ্বালা হয়নি, অলক্ষ্যে চ'লে গিয়েচেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয়, তা যুগযুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে,—কেউবা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউবা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েচি, আহ্বান শুন্‌তে পাচ্চি "এসো," এই পরিষদ আমাকে শ্রদ্ধার আসন দেবার জন্যে প্রস্তুত; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ, এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অন্তত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না!

দেশ বিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এই মাত্র বর্ণনা করেচেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্জ্জমা তাঁদের কাছে পৌঁছেচে, সে তর্জ্জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে, কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সেক্ষেত্রে অল্প হয় তো বেশির চেয়ে বেশি হ'তেও পারে। সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না তলিয়ে দেখে;—লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাট্‌লেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয়

পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়; অনেককে দেখ্‌তে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে এককে দেখ্‌বার বাধা ঘটায়। রস-সাহিত্যে এই এককে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিষ্টকে একদিন বলেছিলুম যে, "ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চ্চা করি কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ ব'লে চেষ্টা কর্‌তে সাহস হয় না।" তিনি বল্‌লেন, "ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁক্‌তে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্চে সার্থক দেখা দেখানো,—যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।"

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থকরূপে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে, কাছের মানুষের কোনো দাবী আমি রক্ষা করি, কোনো দাবী আমি রক্ষা কর্‌তে অক্ষম, কেউ বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হ'য়ে ওঠে; নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট ক'রে তোলে দেশের লোকের চোখের সাম্‌নে সেই দূরত্ব দুর্ল্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল

যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্ত্তমান কালের আল্‌পিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে; তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এই রকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে-খর্ব্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব ক'রে এসেচি। দেশের লোকের সভায় এরি সঙ্কোচ আমি এড়াতে পারিনে। অন্যত্র জগদ্বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বল্‌তে হয়েচে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনো দিন আসেনি, নিশ্চয় জেনেচি তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এদেশে, এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়,—জানি যে, কত কি ঘরাও কারণে ও ঘরগড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এই জন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েচি, কারণ তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন,—আমার মধ্যে যা কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে-সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু একথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদ্গদ ভাষার করুণ রস যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্ত্তের পাত্র পৌছয় না।

যে-জীবলোকে এসেচি এখানে নানারসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্ত্ত্যলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই, বুঝতে পারি এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস,—মরবার পূর্ব্বে এ যদি অঞ্জলি ভ'রে পান কর্‌তে পাই তাহ'লে মৃত্যু অপ্রমাণ হ'য়ে যায়। অনেক দিনের কথা বল্‌চি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু-শয্যার পাশে আমি ব'সে আছি। তিনি বল্‌লেন, "রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।" হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধ'রে বল্‌লেন, "আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্চি তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষ স্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।"

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেননা, চ'লে যেতে হ'বে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়? যেখান থেকে এই কথাটি আস্‌চে, "তুমি আমাকে খুসি করেচ, তুমি যে জন্মেচ সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েচ তার মূল্য আমি মানি।" বর্ত্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে প্রীতি, যে শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে, ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই,—এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাৎ দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি ক'রে জুড়ে ব'সে থাক্‌ব এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি, ভবিষ্যতের আসন

সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত ক'রে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে গাছ ম'রে যায়, অনেক দিন থেকে ঝরাপাতায় সে মাটি তৈরী করে, সেই মাটিতে খাদ্য জ'মে থাকে পরবর্ত্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে সে প্রাণশক্তি পায় না, আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চ'ড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্দ্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালের নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়,—তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান্, আজ সে নতুন কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্য্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধ'রে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম :—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্ত্তমান সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্য সুধা তৃপ্তি করে পূরা ॥

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের

আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃত-রস পরিবেশন কর্‌বার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্ব্বতা চড়া গলায় প্রমাণ কর্‌বার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান কর্‌তে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেচেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রং যদি না ধরে তাহ'লে বুঝ্‌ব সেটাতে তাঁরি অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না ব'লেই তাক্‌ লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠ্‌বার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বল্‌ব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়্‌মার্কেটে "খুন্" ফরমাস কর্‌তে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক্, আর যে-বৃদ্ধদের মরচেধরা চিত্ত-বীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হ'লেও।

এই পরিষদ সকল-বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক্। পুরাতনের নবীনতা বুঝ্‌তে তাঁদের যেন কোন বাধা না থাকে।

সাহিত্য-বিচার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রপরিষৎ সভায় "সাহিত্য-বিচার" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্যে আমার পরে অনুরোধ আছে। মুখে-বলা-কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতিশক্তিশালী লোক একদিনের কথিত বাণীকে অন্যদিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না করে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্য-বিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো, আর বিচারটি হ'ল, পরিচয়—তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য বিচারের লক্ষ্য। কিন্তু পরিচয় তো অনেক রকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক-পরিচয়ের জায়গায় আর এক পরিচয় দাখিল করি; যেখানে এক গ্লাস জল আনা আবশ্যক সেখানে "তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল।" জলের চেয়ে বেলে ভার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার দামও বেশি, কিন্তু যে তৃষ্ণার্ত্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্য-বিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়।

কল্পনা করা যাক্‌ আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে বিচারক হয়তো গর্ব্ব করে বলে উঠবেন, "জাতিতে উনি বৈদ্য।" জিজ্ঞাসু বল্‌বেন, "এহ বাহ্য।" তখন বিচারক আবার গর্ব্ব করে বলতে পারেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন, তাঁর পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর।" জিজ্ঞাসু আবার বল্‌বেন, "এহ বাহ্য।" তখন বিচারক সুর আরো চড়িয়ে বল্‌বেন, "উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত।" হায়রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে ঐসব তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রস-সাহিত্যে এগুলিকে সযত্নেই বর্জ্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মীকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েচে, তখন তিনি নিজের কী রকম চিকিৎসা করৃতেন? বাল্মীকি তাঁর জটাশ্মশ্রু নিয়ে চুপ করে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রাম-চরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসা-পদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে ওকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েচে, তথাপি সেটা সপ্তকাণ্ডর কম হল না।

আমি যে কথাটি বল্‌তে গিয়েচি, সে হচ্চে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে "ব্যক্তি" শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে. তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউবা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে।

সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থ সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্ব্বত সমুদ্র ভালো জিনিষ মন্দ জিনিষ বস্তুর জিনিষ ভাবের জিনিষ সমস্তই ব্যক্তি,—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হ'ল, তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে যাতে আমাদের চিত্ত তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ—সেই গুণটিই সাহিত্য-রচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে অসংখ্য জিনিষকে আমরা পূরোপূরি দেখতে পাইনে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলীস্ ইন্স্পেক্টর বা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলীস ইন্স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন কি, যাদের উপর তারা কর্ত্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্ত্তমান অবস্থার বাহিরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয়, সত্ত্ব রজঃ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়, তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এই জন্যেই সাহিত্য-বিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়ে

শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না, বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়ো লোক বলি যার বড়ো পদ, বড়ো মানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি, ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সঙ্কুচিত। বাঁধারীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই। এই কারণেই যে সাধুসাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল, তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর, যূথীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্ত ঋতু, তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বল্‌তে পারিনে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্চে প্রকাশ।

সেই জন্যেই দেখি আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়। তৃষ্ণার্ত্তের জন্যে আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হোলো শেষকথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষবিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে

সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্য-রচয়িতা। মৃদু-স্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই, নিজের অনিবার্য্য কর্ম্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ করে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্য-রচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দ্দিষ্ট স্থান। কিন্তু বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জ্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি এ যে মারের উপরি পাওনা। বাংলা সাহিত্যের অন্তঃপুরে [illegible]র যাচনদার বাহির হ'তে ঢুকে পড়েচে, কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউল কবি দুঃখ করে বলেচে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেচে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায়, ফুলকে দেয় লজ্জা।

কথা যখন উঠ্‌ল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বল্‌লে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে সংবাদ পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েচে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বলেই সেটা শুনতে হয় খুব মস্ত। এসব কথা ভারী ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্রমানা দেশে এতে করে লোকেও স্তম্ভিত হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্য-বিচারে এসব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠলই, তাহলে একথা মান্‌তেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিনগুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখার কোথাও দেখা দেয়, তমঃ, কোথাও বা রজঃ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজোটাই সব চেয়ে বেশি, একথা প্রমাণ করতে

যাঁরা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ-লেখা ও-লেখা, এ-লাইন ও-লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাত্ত্বিক বলে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাত্ত্বিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী করে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী? উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষা-রূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাকবেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি কিম্বা সাংখ্যদর্শনের সবগুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, একথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে কোনো গুণই তাতে থাক্ বা না থাক্, সবসুদ্ধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেচে। প্রতিভার কোন্ মন্ত্রবলে তা হোলো কেউ বল্‌তে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো এ নিয়ে মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভাল নেই।

কাঁটা গাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপ গাছের প্রকৃতিটা অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে একথা সে ভুল্‌তে পারে না। এই সন্দেহচঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শান্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না; নিষ্কণ্টক অতিশুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হেয়, একথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্যতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে দোষটা সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারি একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি যে জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজ্দারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এই জন্যে সমাজ সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্য্যাদা দেওয়া, ধনের মর্য্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্য-ব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নীচে পড়ে। কিন্তু সাহিত্য জগন্নাথের ক্ষেত্র, এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চল্‌বে না। এমন কি, এখানে বর্ণসঙ্কর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা,—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না, তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দির প্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সঙ্কোচ করে না। হয়তো বলে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেচে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি

রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তাহলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারিদিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়—তাতে চিত্তের নির্জ্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে, তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভৎর্সনা না করেন,—যদি সে না নাচ্‌ত তবেই বুঝতুম ময়ূরটা মরেচে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েচে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেচেন সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাঙলা দেশেই এমন মন্তব্য শুন্‌তে হয়েচে, যে দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।" অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক্,—ওটা হোলো খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হোলো ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হোলো য়ুরোপীয়ত্ব; এই বলে সাহিত্যে খানাতল্লাসী করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে এক-ঘ'রে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন কাউকে জাতে ঠেলেন তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময় ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব্ব এসিয়া তার নিকটসংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে

আশ্চর্য্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এসিয়ায় এনেছিল নব জাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্ত্তী এসিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন করে স্বীকার করতে পারে, তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি, নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেচে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ব্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতাল পঞ্চবিংশতি, হাতেম তাই, গোলেবকাওলি অথবা কাদম্বরী বাসবদত্তার মতো যে হয়নি, হয়েচে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্ব্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত,—যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়,—এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয়, এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির

খোঁটা দিয়ে বর্ণসঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরো একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে কিছুদিন পূর্ব্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেচেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেচে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে দলপতিদের চাটূক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্য-বিচারে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করচে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসঙ্গত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্চে কুমু মানব সমাজে নারী নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পেরেচে কিনা—অথাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েচে কিনা। মানব প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামী। বস্তুত সেকথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নয়।

কথা উঠেচে সাহিত্য বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে আলোচ্য এই—কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ? আলোচ্য-সাহিত্যের উপাদান অংশগুলি? আমি বলি

সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হ'ল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হ'ল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাণ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্বদ্বারা নয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করচে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কাম প্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ।—যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জ্জনের দ্বারা নয় যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে

একশ্রেণীতে ফেলতে হয়, কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর করে বল্‌তে হবে যে সন্দেশ পচামাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে না। কেননা উভয়ে উপাদানে এক, কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্ব-জগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক্ আম। যে ভাবে সেটা ভোগ্য সে ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগী সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্চে ওর প্রাণের লাবণ্য ; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী, তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরাণ দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে—কিন্তু সেটা জড়পদার্থে বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রস-বিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বল্‌তে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়,—আর র‍্যাস্পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতী, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়। পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের অনুকূল কথা হতে পারে, কিন্তু এইরকমের ধর্ম্মমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসঙ্গত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই—সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা, মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

চিত্রাঙ্গদা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমান সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্তত করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।

এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনি এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে কাব্য সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিষটে সাহিত্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুল কলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশি। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক টেন-এর "ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস" আমরা অনেকেই পড়েছি; কেননা ইংরাজি সাহিত্যের M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের ক'জনের আছে? এক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনও বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও, একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে ও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। Gervinus অথবা Dowden এর সমালোচনা পড়ে ক'জন পাঠক Shakespeare এর কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন? আমরা যখন Taine পড়ি অথবা

Gervinus পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলজফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক-দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানেন যে, কাব্য হচ্ছে ফিলজফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্ত্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।

২

আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি এ কথা বলতে চাইনে যে, কবি ফিলজফার হতে পারে না, আর ফিলজফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাঁকে লোকে মহাদার্শনিক মনে করে, অপর পক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাঁকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন ত কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন কি Spinozaর Ethics জিওমেট্রির পদ্ধতিতে লেখা হলেও তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য।—অপরপক্ষে Shelly, Shakespeare এর ফিলজফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত না আলোচনা হয়েছে। এমন কি 'Rabindranath as a philosopher' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপর পক্ষে উপনিষদ্ কাব্য কি দর্শন তা মনীষিবৃন্দ আজও ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuition এর সঙ্গে concept এর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুল্‌তে চাইনে কেননা, সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক ;—অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চ্চা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা।

আমি সুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,

কাব্য-সমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলজফার হতে বাধ্য। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা বিশেষ। গ্রীসে আরিষ্টটল্ যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এদেশে অভিনব গুপ্ত ও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।

আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসীদেশের নবযুগের সমালোচকরা নিজেদের impressionist বলে পরিচয় দেন—অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্য বস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনও সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোনও মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনি যখনি বলি এ বস্তু সুন্দর, তখনই একথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। Universal validity অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলিনা কেন একটা না একটা ফিলজফি তার মধ্যে থেকে উঁকি মারবে। আর সে ফিলজফি যে কত কাঁচা অথবা পচা তা ধরা পড়্‌বে আপনাদের দার্শনিক চূড়ামণি president এর কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য magic হতে পারে কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

৩

আর এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার reason এর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, যা ষোল আনা unreason এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনও

কাব্যবিশেষের নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায় এ নিন্দা প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ দ্বেষ! কোনও কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ বিরাগ কাব্যজগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা। এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়। আলঙ্কারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে গড়া সেই হৃদয় যা প্রাণীমাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয় এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনওরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারিনে। তা যে পারিনা তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন, কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্য-জগতের ধর্ম্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারিনে কারণ কাব্য-জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানিনে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে। কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তাঁর rulesএর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই—সে নিয়মাবলীর সাহায্যে সেক্সপিয়ারের নাটক বিচার করা যায় না। Bergson যাকে বলেন creative evolution কাব্য-জগতে সৃষ্টির মূলপদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেননি, কারণ সে কাজের ভার ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।

৪

রবীন্দ্র পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্ব্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে কি এক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি? জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্য সমালোচকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, "পৃথিবীতে, কোনও দেশে কোনও কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে?—না লোকমতে যারা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে সেক্সপিয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ?" এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে হাঁ তাই। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগরলঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবিবিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ, কবিত্বশক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্ব্বে বুঝতে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিক বামনাচার্য্য বলেছেন যে, "কবিত্ববীজং প্রতিভানম্" এবং উক্তসূত্রের তিনি বক্ষ্যমানরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—"কবিত্বস্তবীজং কবিত্ববীজং জন্মান্তরাগত সংস্কারবিশেষঃ।" এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার? "জন্মান্তরাগত সংস্কারবিশেষঃ" বলায়, সুধু বলা হয় যে, কবিত্বশক্তি অলৌকিকশক্তি অর্থাৎ mysterious। আমরা অপরের প্রতিভা থাকলে

তা চিন্‌তে পারি কিন্তু তা যে কি তা স্পষ্ট করে বল্‌তে পারিনে। এর কারণ প্রতিভা স্ব-প্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ আরিষ্টটল্ থেকে হেগেল্ পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে psychology নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায়না তার প্রমাণ, ও বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকরা physiologyর অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মত ও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার বক্তব্য এই যে প্রতিভা যদি একরকম insanity হয় তাহলে এ জাতীয় insanity অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্তত আমি ত নেবই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাঁদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেরাই realise করেছেন, আর সে আলোক যাঁদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তাঁর একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৫

কোনও কবিকে বড় কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে কাব্যের প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকরা এ প্রশ্নের যাহোক একটা না একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাঁদের দুএকটা মতের উল্লেখ

করব। এস্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতামত পাঁচজনকে ফুর্ত্তি করে শোনাই,তার কারণ এ নয় যে আমি তাঁদের কথা এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিম্বা তাঁদের মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলঙ্কারিক হিসাবে আরিষ্টটল্ বড় কিম্বা দণ্ডী বড়, হেগেল্ বড় কিম্বা বিশ্বনাথ বড়, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই প্রবৃত্তি ও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দোহাই দেই তার একমাত্র কারণ আমি বাঙলা ভাষায় কথা কই। আর সংস্কৃত কথা বাঙলা ভাষার মধ্যে যত সহজে যত বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জার্ম্মাণ কথা ততই সহজে সমালুম বেখাপ্পা হয়।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক; বামনাচার্য্য বলেছেন—"কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতিকীর্ত্তিহেতুত্বাৎ।" বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা করেছেন—"কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ। অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্ত্তিহেতুত্বাৎ।" সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা এত সাঁটে কথা কন্ যে আমাদের পক্ষে তাঁদের রচিত্র সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যা ও প্রায় তদ্রূপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্য্যের কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্য-ভোক্তার প্রীতি, আর তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্য-কর্ত্তার কীর্ত্তি। এখন এই অদৃষ্টপ্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্ট প্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়া চাড়া করা যাক্, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্ত্তা নন্—সবাই ভোক্তা। কর্ত্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ কবিকীর্ত্তি আমরা কেউই লাভ করিনি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেচি।

৬

কাব্যরস আস্বাদ ক'রে যে আমরা প্রীতি লাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা যা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে তর্ক নেই—সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে, কেননা যুগ যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure তাহলেই বামনাচার্য্যের মতকে hedonism এর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও মত অগ্রাহ্য কেননা ও মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে অর্থাৎ মাল্যচন্দন বনিতার দলে পড়ে যায়। এতর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেদার করেছেন। বোধহয় তাঁদের সমধর্ম্মী পণ্ডিতের দল এদেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণে নব্য আলঙ্কারিকরা প্রীতির বদলে "আনন্দ" শব্দের উপরেই ঝোঁক দিয়েছেন। এমন কি নব্য আলঙ্কারিকদের আদি গুরুর নাম আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য। এ আনন্দ যে কোনও লৌকিক আনন্দ নয় সে কথা নব্য আলঙ্কারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরাজি pleasure নয় joy। "A thing of beauty is a joy for ever"—কবি keats এর বাণী তাঁরা বিনাবাক্যে শিরোধার্য্য করে নিতেন কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্টপ্রয়োজন একথা বলার অর্থ কাব্যামৃত রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত কাব্যের অপর কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility।

একথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরাকালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে

মানুষের রক্তমাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধন করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।

৭

কাব্যামৃত-রসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাঁদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভবযন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে মুক্তি প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দলাভ করে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, সকল দেশে সকল যুগেই অলঙ্কার শাস্ত্র হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চ্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।

একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই, আছে অন্ধ ভক্তি। কারণ জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে জীবন হচ্ছে ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্ত্তকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয় ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময় কিন্তু আমাদের পক্ষে পরম পুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয় তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনীশক্তির হ্রাস করা কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা।

এখন আমরা Evolution নামক নূতন বিশ্বকর্ম্মার সন্ধান পেয়েছি তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্ত্তা, evolution এর দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং মানুষের যতপ্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এযুগে যথার্থ মানবধর্ম্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এযুগে আমরা সবাই হয় economical নয় political নয় social সমস্যার হাতে কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এই সব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায় সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এসব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় সুধু অল্প বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে কাব্য থেকে কি শিক্ষা লাভ করলুম কি আনন্দ লাভ করলুম তা নয়। এ জাতীয় সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপাকার ধনঞ্জয় বলেছেন—

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধি
যোঽপিতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।

এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি আধুনিক মত। যে মত অতি পুরাতন এবং সেই সঙ্গে অতি নূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল অর্থাৎ সত্য।

৮

রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষালাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সে সব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একখানি কাব্যের উল্লেখ করব যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধুলোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন যদিচ তাঁদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন—Thomson নামক জনৈক ইংরাজ মিসনারী। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে

"It is his loveliest drama; a lyrical feast, though its form is blankverse."

"It is almost perfect in unity and conception, magical in expression."

যাঁরা কাব্যের রস উপভোগ করেন তাঁরা এর বেশি কোনও কাব্য সম্বন্ধে আর কি জানতে চান? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরও একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তাঁরা না করে থাকতে পারেন না। তাই Thomson বলেছেন—

"The play was attacked as immoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops."

"The purpose of the play has been represented as the glorification of sexual abandonment."

"The play in these earlier passages repeatedly

trembles on the edge of the bog of lubricity." তারপর এর চাইতেও এ কাব্যের নাকি একটি বড় দোষ আছে। Thomson বলেন "The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude."

Thomson সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।

২

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানব মনের একটি অনিন্দ্য-সুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্ব্বকালের মানুষের মন-পুরীর রাজরাণী, হৃদয়-নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানব মনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমারসম্ভবের শৈল আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিওগ্রাফিতে এ সব লোকের সন্ধান মেলেনা কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি সুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ ক'রে এই কল্পলোক রচনা করে; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্ব্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভাল কথা, আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও

ত মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রকৃত-লোক দুইই মানব মনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে এ দুটি মানব মনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subjectএরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগত ওরফে মানুষের কর্ম্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। কর্ম্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য কেননা আমাদের মনে যেমন কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্ম্ম জগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নের ও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন সুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয় বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয় বাসনা ব্যক্তি-গতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অতি-রিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষ মাত্রই বাস করে কতকটা কর্ম্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

১০

এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যমানুষের যৌবন-স্বপ্নের একটি অপূর্ব্ব এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।

ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা "সুন্দর"

শব্দটি বার বার ব্যবহার করতে বাধ্য হই যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বার বার সত্য শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truth এর বাচ্য পদার্থের মত অনির্দ্দেশ্য বস্তু আর ভূভারতে নেই। তাই আমরা সৌন্দর্য্য শব্দের বদলে সৌন্দর্য্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি যথা মাধুর্য্য ঔদার্য্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি এ সব নামই সৌন্দর্য্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এসবের প্রসাদে সৌন্দর্য্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যে সকল দার্শনিকরা beauty truth প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তাঁরা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেন। অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।

কোনও কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিষটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর সকলেই জানেন যে ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনও প্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য্যও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্ত্বা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই বৌদ্ধরা তাঁকে ধর্ম্মকায় ও বৈষ্ণবেরা মনোকায় বলে উপলব্ধি করতেন।—সুতরাং কাব্যকে ভাষাকায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্তত এদেশে গণ্য হবো না

১১

কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডিকাব্য তিনি লেখেননি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন, ভারত-চন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে, অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্যকোনও দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণবর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর "বীণা গুণে তরল অঙ্গুলি।"

কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয় স্থূল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করেনি, কারণ তাঁর অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল তা যাঁর ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দুলাইন পড়্‌লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথায়ও একটি বেসুরো কথা নেই আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছৃঙ্খল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি একমুহূর্ত্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিম্বা ছাড়িয়ে ওঠেনি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ। যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্তছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্যসরস্বতী নিজহাতে লিখেছেন বল্লে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুমনা।

ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে:— "যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।"

চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে "বড়

ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্ত সখে! সে বাসনা
পূরাও আমার স্বধু দিনেকের তরে।"

বসন্তসমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যের ও দেহ অপূর্ব্ব পুলকভরে ফুটে উঠেছে।—এভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।

১২

আমাদের নিত্যকর্ম্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরাজী ভাষা ও সেক্‌স্‌পিয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে কোনও সংবাদ-পত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর সেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকের একপৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে উপায়ন্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সে সব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতি-সাপেক্ষ। যে কোনও বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা সুরু করিনে কেন, লজিকের সাহায্যে কতকদূর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে লজিকের হাত ধরে আর বেশিদূর এগোনো চলেনা। কেননা তখন আমরা এমন একটি সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করি যার নাম mystery। এর

কারণ ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" এই ব্যক্তমধ্যই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে তাহলে বলা হয় যে কবির ভাষা অনির্ব্বচনীয়, কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery,—তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্ম্মের ভাষা static অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্ম্মের অবসান হয়। কবির ভাষা dynamic অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলঙ্কারিকরা বলেছেন—

"ইদমন্ধম্ তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারংন দীপ্যতে।"

কবির মুখঃনিসৃত এ শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত হয় এবং নানাভাবকে অঙ্কুরিত করে; ফলে, আমাদের মনোজগতের প্রাণের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে দেয়। কবির বাণী তার অন্তর্গূঢ় শক্তির বলে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগতের বিরাট অব্যক্ত অংশের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় যাদুকরী ভাষা যার সাক্ষাৎ আমরা ইংরাজ কবি Keats এর কবিতায় পাই। এক কথায় এ হচ্চে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনীশক্তির মূল হচ্চে কবির আত্মায়। সে যাই হোক ভাষার সঙ্গে কাব্যের এতটা আত্মীয়তা আছে যে, ইউরোপে অনেকে কবিকে a great voice আখ্যা দিয়েছেন।

১৩

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যের সৌন্দর্য্য নগ্ন নয় অলঙ্কৃত। এমন কি তাঁদের মতে কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ। যে অলঙ্কারের গুণে কাব্য গ্রাহ্য সে গুণটি কি? বামনাচার্য্য বলেছেন যে "সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ।"

সৌন্দর্য্য অর্থ অলঙ্কার আর অলঙ্কার অর্থ সৌন্দর্য্য, এ রকম ব্যাখ্যা শুনে এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরে থেকে যাই। আমি বালককালে একটি বঙ্গদেশীয় মুসলমানের মুখে একটি "হররা" ঘোড়ার কথা শুনি। "হররার" অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করলেন "বোরা"। তারপর "বোরা" কাকে বলে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন "মুসকি"। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি অবশ্য তাঁর আরবী ও ফার্সি ভাষায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট তারিফ করি কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ধারণা হয় ভদ্রলোক কি বলতে চান তা তিনি নিজেও জানেন না। কেননা যদি জানতেন ত, ও রঙের বাঙলা নামটাই বলে দিতেন।

সুতরাং বামনাচার্য্য যখন অলঙ্কার শব্দ কি connote করে তা বলতে না পেরে কি denote করে তাই বললেন তখন তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। যখন শুনলুম "পুনরলঙ্কার শব্দোহয়মুপমাদিষু বর্ত্ততে" তখন নিশ্চিন্ত হলুম।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত "কাব্যজিজ্ঞাসা" নামক একটি অতি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলায় লিখেছেন। সে প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েচেন যে নব্য আলঙ্কারিকদের মতে উপমাদি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কাব্য হয় না, অপরপক্ষে বহু অনলঙ্কৃত বাক্য চমৎকার কাব্য! এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে দেদার আছে। কিন্তু অলঙ্কার যে কাব্যকে শোভাহীন করে এমন কথা কোনও আলঙ্কারিক বলতে পারেন না তা তিনি যতই নব্য হোন না কেন। কেননা, উপমাদি যদি কাব্য-দেহের কলঙ্ক হত তা হলে কালিদাসের কাব্য পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কলঙ্কিত। অতএব কোন্‌স্থলে কিরূপ উপমাদি প্রকৃতি-সুন্দর কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

আমি এ স্থলে স্থধু ছুটি মূল অলঙ্কারের কথা বলব—একটি অনুপ্রাস অপরটি উপমা। সংস্কৃত মতে একটির নাম শব্দালঙ্কার অপরটির নাম অর্থালঙ্কার! কিন্তু এ উভয়ই মূলত সমধর্ম্মী! দণ্ডী বলেছেন—

"যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥"

তারপর

"যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শতে।"

অর্থাৎ এক অলঙ্কারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয় অপর অলঙ্কারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তু সদৃশ প্রতীয়মান হয়।

এ বিশ্বে আমাদের আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন তার সমীকরণ করাই হচ্চে কাব্যের ধর্ম্ম অর্থাৎ যা কিছু পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে স্থধু কবি-প্রতিভা। পরাবিদ্যা যেমন আমাদের লৌকিক ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে, কাব্যও তেমনি আমাদের লৌকিক ভেদদৃষ্টি নষ্ট করে। এই বিশ্বে বহুর সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্চে মুক্তির রসাস্বাদ। কারণ যে মুহূর্ত্তে ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয় সেই মুহূর্ত্তে অহং আত্মা হয়ে ওঠে।

আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় ত বলা বাহুল্য যে অনুপ্রাস ও উপমা দুইই কাব্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ। কারণ দৃশ্যজগৎ ও শব্দজগতের নিগূঢ় সত্য ব্যক্ত করাই এদের ধর্ম্ম। এ দুই যখন কাব্যের অন্তরঙ্গ না হয়ে বাহ্য অলঙ্কার হয় তখনই তা অগ্রাহ্য। ভাষার ও ভাবের খেলো জমির উপর উপমা অনুপ্রাসের চুমকি বসানো স্থধু মন্দ কবির কারদানি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস ও উপমা উভয়ই ও কাব্যের

অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটিও অনুপ্রাস কিম্বা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়। সঙ্গীতে যেমন সেই তানের চমৎকারিত্ব আছে যে তান রাগিণীর প্রাণ থেকে স্বতঃ উৎসারিত তেমনি চিত্রাঙ্গদারূপ রাগিণীর অন্তরে বহু অনুপ্রাস আছে যা উক্ত রাগিণীর অন্তর থেকে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয়েছে।

"সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে।"
"শেফালিবিকীর্ণ তৃণ বনস্থলী দিয়ে"
"ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভরে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা।"

এসব অনুপ্রাস যে চমৎকার তার সাক্ষী কান। কিন্তু এ সব অনুপ্রাস অযত্নসুলভ। ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সঙ্গীত-প্রাণ কাব্যের অন্তর হতে। টমসন সাহেব বলেছেন যে এ কাব্য 'magical in expression' যদিচ তা অমিত্রাক্ষরে রচিত। এ কাব্যে যে অন্ত-অনুপ্রাস নেই তার কারণ সমগ্র কাব্যখানিই একটি একটানা অনুপ্রাস।

১৪

আসল কথা এই যে অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা। নব্য আলঙ্কারিকরা অলঙ্কারের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অতিশয়োক্তি হচ্চে একমাত্র অলঙ্কার। প্রাচীনেরাও এ অলঙ্কারকে সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার বলে গণ্য করেছেন। এ অলঙ্কার যে কি তা প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মুখেই শোনা যাক—

"বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্ত্তিনী
অসাবতিশয়োক্তি স্যাদলঙ্কারোত্তমা যথা।" কাব্যাদর্শ

"লোকসীমাতিবৃত্তস্য বস্তুধর্ম্মস্য কীর্ত্তনম্
ভবেদতিশয়ো নাম সম্ভবোঽসম্ভবো দ্বিধা।"

অগ্নিপুরাণ

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের উপমারূপকাদি উক্ত অর্থে অতিশয়োক্তি অর্থাৎ তাদের গুণে বর্ণিত বিষয় সব লোকসীমা অতিক্রম করে, ইংরাজীতে যাকে বলে transcend করে। এই সর্ব্বোত্তম অলঙ্কারের স্পর্শে সমগ্র কাব্যশরীরের রূপলাবণ্য ও লোকোত্তর হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যা natural তা supernatural বলে প্রতিভাত হয়। আমি নিম্নে চিত্রাঙ্গদা থেকে দুচারটি ঐ জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাদের নাম উপমাই হোক্ রূপকই হোক আর উৎপ্রেক্ষাই হোক তার প্রতিটি যে অপূর্ব্ব অতিশয়োক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। চিত্রাঙ্গদা মদনের বরে ক্ষণিকের জন্য ফুলের মত ফুটে উঠে বলছেন :—

"যেন আমি ধরাতলে
একদিন উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল, একটি প্রভাত
শুধু পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে
হবে, ভ্রমর-গুঞ্জনগীতি বসন্তের
আনন্দ মর্ম্মর, তার পরে নীলাম্বর
হ'তে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
বায়ুস্পর্শভরে টুটিয়া লুটিয়া যাব
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীটুকু আদি অন্তহারা।"

এমন সুন্দর এমন মর্ম্মস্পর্শী পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুমকাহিনী আর কোনও কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন ?

১৫

পুষ্পরাজ্যে আবিষ্কৃত আর একটি উপমার পরিচয় দিই। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তাঁর সদ্যপ্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান :—

"সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেতশতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি'—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।"

এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল 'রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে।'

আলঙ্কারিকদের মতে কবির যে যাদুমন্ত্রের বলে সাদৃশ্য সাযুজ্যে similarity identityতে পরিণত হয় সেই উক্তিই অতিশয়োক্তি। তাঁরা উদাহরণ স্বরূপ বক্ষ্যমান শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

"মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীনাদ্রচন্দনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ"

অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন, কেননা তিনি মল্লিকার মালা ধারণ করেছেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করেছেন, এবং ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন। এখন চিত্রাঙ্গদার বিষয় কবির একটি উক্তি শোনা যাক্।

"উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়; পূর্ব্বপর্ব্বতের

শুভ্রশিরে অকলঙ্ক নগ্নশোভা করি
বিকশিত, তেমনি বসনখানি তার
অঙ্গের লাবণ্যে মিলাতে চাহিতেছিল—
মহাসুখে।"

এ কবির সাক্ষাৎ পেলে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের যে দশা ধরত সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এরূপ উক্তির চিত্রাঙ্গদায় আর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে আমি আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্চি "স্বয়ং পশ্য বিচারয়।" এখানে আর দুটি মাত্র উপমার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। চিত্রাঙ্গদা সুপ্ত অর্জ্জুনের সম্বন্ধে বলছেন—

"শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তার
প্রভাতের চন্দ্রকলা সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।"

দ্বিতীয়টি অর্জ্জুনের উক্তি

"তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার।"

উক্ত কথাক'টিতে কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন, "অতিবাদী হও আর লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে ত ব'লো যে হাঁ আমি অতিবাদী।" কবিমাত্রই অতিবাদী। আর এই "অতি" শব্দের মর্ম্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবেন যে চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।

১৬

আমি পূর্ব্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। Thomson সাহেব এ কথা অস্বীকার করেন নি, কেননা তিনি বলেছেন যে "it is a lyrical feast" কিন্তু উক্ত feast উপভোগ করে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিণীর অস্থায়ি erotic এবং অন্তরা immoral।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবিতা সঙ্গীতের স্বজাতীয় তাহলে জিজ্ঞাসা করি কানাড়া moral এবং কেদারা immoral, ভূপালী শ্লীল ও ভৈরবী অশ্লীল এরকম কথা বলায়, ছন্নতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেওয়া হয়?

যদি এ মত কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত Thomson এর মত হ'ত তাহলে এ বিষয়ে কোনও কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি যে আর্টের moralityর বিচার করতে অনেকে সদাই উৎসুক। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে morality অত্যাবশ্যক। এবং সেই কারণে জীবনের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আমরা সর্ব্বত্রই খুঁজতে যাই। চুরি করা যে অধর্ম্ম এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। যাঁর নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তাঁর জিনিষ পরে চুরি করলে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে, পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরির একটি চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শর্ব্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্ত্তন আছে। যা মানুষ মাত্রেরই মতে immoral সেই বিষয় নিয়ে কবি তাঁর কল্পনা খাটিয়েছেন অথচ অদ্যাবধি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেননি। এর কারণ কি? এর কারণ সমাজে যা অধর্ম্ম-কাব্যে তা রসে পরিণত

হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় না। Morality হচ্চে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিষ আর কাব্য তার অন্তরাত্মার। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে ব্যবহারিক আত্মার প্রভেদ কি তা যদি জানতে চান ত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করুন। কাব্যের যে জীবনের উপর কোনও প্রভাব নেই, একথা অবশ্য আমি বলতে চাইনে; কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense এর কাছে নয় spiritual sense এর কাছে। যা spiritual হিসাবে অমৃত তা যে moral হিসাবে বিষ একথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে মনের spiritual খোরাক মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।

১৭

চুলোয় যাক্ অন্তরাত্ম' ব্যবহারিক আত্মার দিক থেকেই দেখা যাক্ কবির স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা (attitude) কি হিসেবে জঘন্য? তা যে ঘৃণ্য সে কথা Rollo নামক অপর একটি অধ্যাপক স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—"One hates the view" এবং Thomson এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবির মতে নাকি "Woman exists for man's sake।" চিত্রাঙ্গদার শেষ কথাগুলিই নাকি কবির মনের কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ যে তাই।

চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন এই যে—তিনি অর্জ্জুনের শুধু প্রণয়িনী নয় তাঁব সহধর্ম্মিনীও হতে চেয়েছিলেন। এই সহধর্ম্মিনীর আদর্শ নাকি সেকালের অসভ্যদের আদর্শ। কিন্তু একালের সভ্যমানবের অর্থাৎ ইংরাজের আদর্শ হচ্চে স্ত্রীলোকের পুরুষের সমধর্ম্মী হওয়া। পিতা যখন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র করেছিলেন তখন অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য ছিল তাঁকে

ভ্রাতা করা। তাহ্‌লেই Thomson এবং Rolloর কাছে এ কাব্য জঘন্য না হয়ে বরেণ্য হ'ত।

যখন এঁদের মুখে এসব বুলি শুনি, তখনই মনে হয় যে বর্ত্তমান সভ্যতার বুলিগুলি যেমন সাধু তেমনি ভুয়ো। Equality of the sexes বহুলোকের মুখে একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা, কেননা এক্ষেত্রে সাম্যের সঙ্গে ঐক্য শব্দের অর্থের প্রভেদের প্রতি তাঁরা নজর দেননি। Woman exists for man's sake একথাটা তেমনি হাস্যকর যেমন man exists for woman's sake কথাটা হাস্যকর! সত্যকথা এই যে এই দুটো কথাই আংশিক হিসাবে সত্য। Thomson পরে বলেছেন যে individual rights of women এ চিত্রাঙ্গদার কবি বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি না করেন তার কারণ অপরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত individual বলে কোনও জীব নেই। অতএব তার কোনও rights নেই। অধিকার কর্ত্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানবের কথা, সুতরাং প্রতি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য কর্ত্তব্য বন্ধন আছে। স্ত্রীজাতিকে তার মনের ও জীবনের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমরা woman কে man করতে পারবনা, পারব সুধু তাকে female করতে কারণ instinct এর বন্ধন থেকে কোনও জীবকে মুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। Thomson যে সভ্যতার মুখপাত্র সে সভ্যতার বোধহয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোনও রকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।

স্ত্রীজাতি যে মানুষ হিসেবে পুরুষজাতির equal, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এ সত্যের সন্ধান যুগযুগান্তরের পরে পেয়েছে। বাইবেলের মতে নারী আদিমমানবের একখানি পাঁজরার হাড় হতে সৃষ্ট। যুগ যুগ ধরে তারা একথা বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে এসেছে। অতঃপর তাদের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল তখন তারা সেই অস্থিজ জীবকে

আবার মানুষ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো এবং তাদের কাছে যথার্থ মানুষ হচ্ছে পুরুষ মানুষ। তাই তারা কাজে না হোক্ কথায় বিধির নিয়ম উল্টে দিতে চায়। হিন্দুর কল্পনা কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন। কালিদাস বলেছেন—

"স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥"

এ শুধু কবি-কল্পনা নয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ একই কথা। মনু বলেছেন—

"দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎপ্রভুঃ ॥"

১৮

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—

"আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।"

এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা। এবং কবি-প্রতিভার বলে এ পুণ্য-মুহূর্ত্ত একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। যা জীবনে ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট। বসন্ত বলেছেন—

"একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন
হে সুন্দরী"

আর মদন—

"সঙ্গীতে যেমন ক্ষণিকের তানে,
গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন কথা।"

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্ম্মকথা মদন ও বসন্তই অমর বাণীতে বলে দিয়েছেন।

যে দেব "নারীরে হইতে নারী পুরুষে পুরুষ" চেতন ক'রে দেয় তাঁর গ্রীক নাম eros এবং এই কারণেই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সমালোচকরা এ কাব্যকে erotic বলেন।

এখন ইংরাজী ভাষায় এ শব্দটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। Erotic loveএর বাঙলা আমি জানিনে, সম্ভবত তাঁরা যাকে platonic love বলেন, এ love তার উল্টো। এবং এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে উক্ত কারণে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল। এখন এ কাব্য শ্লীল বা অশ্লীল সে বিচার করবার একটি বাধা আছে। চিত্রাঙ্গদা যে অশ্লীল নয় তা প্রমাণ করতে হলে আমার যুক্তি সব অশ্লীল হয়ে পড়বে আর আমি যখন দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করছিনে, তখন শ্লীলতার সামাজিক বন্ধন লঙ্ঘন করবার আমার কোনও অধিকার নেই। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্চে সৌন্দর্য্য, সত্য নয়—সুতরাং এক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড় কথা।

Love বিষয়ে শ্লীলতা রক্ষা করে আলোচনা করা যে অসম্ভব, তার সাক্ষী স্বয়ং Plato। তাঁর যে পুস্তক থেকে platonic love এর কিম্বদন্তী জন্মগ্রহণ করেছে সেই Banquet নামক অপূর্ব্ব দার্শনিক বিচার বাঙলায় কথায় কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য হবে। প্লেটনিক love এর বিচারই যদি এতাদৃশ ভয়াবহ হয়, ত অ-প্লেটনিক love এর বিচার যে বীভৎস হবে তা বলাই বাহুল্য।

১৯

প্লেটনিক love একটী আকাশ-কুসুম। সুতরাং একদল লোকের কাছে তা' যেমন বিদ্রূপের বিষয়, অপর আর একদল লোকের কাছে তা তেমুনি শ্রদ্ধার বিষয়। এখন উক্তমতের ভক্তদের জিজ্ঞাসা

করি, কুসুম মাত্রই কি আকাশ-কুসুম নয়? গাছের মূল থাকে মাটীতে কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশী করে মনে পড়ে, সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না—পায় শুধু মাটীর। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশ-কুসুম মাত্র—এবং তাতেই তার সার্থকতা, কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টিপ্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তা মনোজগতের বস্তু হ'লেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফুলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে, তেমনি মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তারপর দেহমনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ?
ভারতচন্দ্র বলেছেন :—

> "ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নর-নারী কলেবরে।
> গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে॥
> উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
> চেতনাচেতনে মিলি দুইজনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
> অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া এ কি করে চরাচরে॥"

দি কোনও কবির কল্পনায় দেহদেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কাম-লোকের উপরে রূপ-লোক বলে আর একটী লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কাম-লোক থেকে রূপ-লোকে তুলতে পারেন—তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপ-লোকের বস্তু কাম-লোকের নয় তা, যাঁর অন্তরে

চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই—অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?"

চিত্রাঙ্গদা। "তাই বটে।"

এ কাব্য সম্বন্ধে এই শেষ কথা। Erotic কাব্য বলে কোনও বস্তু নেই কেননা যে মুহূর্ত্তে কবির কল্পনা কাব্য-আকার ধারণ করে সেই মুহূর্ত্তেই তা eroticism অতিক্রম করে। আমি পূর্ব্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা, মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের স্বজাতি এবং মেঘদূত ও কুমারের মতই তা কাব্যজগতে অমর। চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীত—অতএব তা চরম কাব্য কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন, এর অস্থায়ী অন্তরার পর যদি আভোগ সঞ্চারী থাকৃত অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরও বিস্তৃত হত তাহলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে স্বষুপ্তিলোকে চলে যেতো।

বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের অনেক মাসিকপত্রে সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে একটা আলোচনা উঠেছিল। প্রতিবাদীপক্ষ থেকে এই একটা আপত্তি উঠেছিল যে সাহিত্য বস্তু-তান্ত্রিক হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক নন এজন্য তাঁর প্রতিও অনেক রকম কটাক্ষ হয়েছিল। বস্তুতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনেক আলোচনায় অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভাবে আমিও একটু সামান্যভাবে যোগ দিয়েছিলুম এবং সবুজপত্রে অভিনবের ডায়েরী নামে একটা প্রবন্ধ ছেপেছিলুম। এ দ্বন্দ্ব যে আজও মিটেছে তা নয়, অতি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, কালি-কলম, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি একত্র হয়ে বেশ একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। বিবাদটা এখন আর বস্তুতান্ত্রিকতা এই নাম অবলম্বন ক'রে চল্‌ছে না, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে বিবাদটার মূলে এই রকম একটা মতের স্বপক্ষে বিপক্ষে টানাছেঁড়া চলেছে। বস্তুতান্ত্রিকতা কথাটা আমাদের দেশের কোন প্রাচীন কথা নয়। ইংরেজীসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে কোনও ইংরেজী ভাবের বাংলা তর্জ্জমার চেষ্টায়ই এই শব্দটিব উৎপত্তি। আমার সন্দেহ হয় ইংরেজীতে realism ব'লে যে একটা কথা চলে সেইটা থেকেই বাংলায় এই শব্দটির উৎপত্তি। ইংরেজী সমালোচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে কিছুদিন ধ'রেই প্রচলিত করবার চেষ্টা চলেছে, এবং সেই চেষ্টার ফলে ওদেশে যে সব ঝগড়াঝাঁটি চলেছে আমরাও বাংলা ক'রে সেই সব ঝগড়াঝাঁটি সুরু করেছি।

ঝগড়ার স্থরুতেই ঝগড়ার বুলিগুলি তর্জ্জমা করা নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছিল।

আধুনিক কালে ইংরেজী ভাষায় realism ব'লে যে শব্দটি চলে সেটি সাহিত্য থেকে দর্শনশাস্ত্রে এসেছে কি দর্শনশাস্ত্র থেকে সাহিত্যে গেছে, সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ নিয়ে আমি একটা নূতন বিবাদ আরম্ভ করতে চাই না; তবে আমার মনে হয় যে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে realism বা neo-realism ব'লে যে শব্দটি পাওয়া যায় তার অর্থটি বেশ পরিষ্কার এবং ব্যাপক। আমার আরও মনে হয় যে সেই অর্থটি ধীরপ্রসারিত নানা গৌণ অর্থে সাহিত্যিক realism এর সকল অর্থকেই পরিষ্কার ক'রে দেয়। আমরা যখন নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে নানা বস্তুকে জানি তখন এই জানার সঙ্গে যে বিষয়টি জানি তার কি সম্পর্ক সেই প্রসঙ্গে এই realism বাদটি আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে উঠেছে। প্রাচীন ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রেও realism ব'লে একটি মত ছিল, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন ধ'রে ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে এই নিয়ে একটা ঘোরতর কলহ বেধেছে যে, যে বিষয়টি আমরা জানি, সে বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকৃতি আমাদের জানাদ্বারা কোনও রকমে পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হয় কি না। নবীনেরা বলেন যে রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ যা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর সেগুলি ঠিক তেমন তেমনটি হ'য়েই বাইরে রয়েছে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়ে যখন সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কসৃষ্টি হয়, তখনই সেগুলিকে আমরা "জানি" ব'লে ব্যবহার করি। জানা ব'লে জিনিযটা যদি সংসারে একেবারেই না থাকত, তথাপি জান্‌বার বিষয়গুলির অর্থাৎ রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনওরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন হ'ত না। দৈহিক বা আন্তরিক নানাপ্রকার ভাবপরম্পরা ও সুখদুঃখাদি

বোধ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই আপন আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান। মন সেগুলিকে কোনও রকমে আপন ইচ্ছায় গড়েপিটে নিতে পারে না, বা পরিবর্ত্তিত করতে পারে না; মনের কাজ হচ্ছে সেগুলিকে শুধু জানা। আমি এই জন্যে এই realism মতটিকে তর্জ্জমা করতে গেলে তাকে যথাস্থিততত্ত্ববাদ বলব—অর্থাৎ যেটি যেমন আছে সেটি ঠিক তেমনই আছে; আমাদের জানার দ্বারা যথাস্থিত বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এঁদের বিপরীতবাদিদের idealist বলা যায়। তাঁরা বলেন যে জানার সঙ্গে জানার বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে জানা ছাড়া বিষয়টি যে কি তা বলবার কোনও উপায় নেই। জানার মধ্য দিয়েই বিষয়টি নিজেকে প্রকাশ করে, তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনটিই জানার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'য়ে, আলগা হ'য়ে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে এমন কথা বলার উপায় নেই, কারণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ব'লে যা কিছু আমরা জানবার বিষয় বলি সেগুলি সবই ত জানারই বিভিন্ন রূপ, তাই জানা ছাড়া সেগুলির কোনও পৃথক অস্তিত্ব বোঝ্‌বার উপায় নেই। এঁদেরই অনেকে আবার এমনও বলেন যে জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের যে সম্পর্ক সেটা পরস্পরাপেক্ষী একটা জীবনপ্রবাহের মত। সকালে যেটি বর্ণহীন, গন্ধহীন কুঁড়ি ছিল, বৈকালে সেইটিই রূপে, গন্ধে ভরপূর, কাল যে বীজটি প্রস্তর খণ্ডের মত মাটির মধ্যে প'ড়ে ছিল, আজ সেইটিই সবুজ অঙ্কুর হ'য়ে মাটি ভেদ ক'রে উঠেছে। সমস্ত জীবনের ব্যাপারেই আমরা দেখ্‌তে পাই যে থাকা ব'লে কোনও জিনিষ নেই, কেবল হওয়ারই স্রোত চলেছে। আমাদের সঙ্গে আর আমাদের জানার সঙ্গে এমনি একটা জীবন-ব্যাপার চলেছে যে এদের কোনটিকেই এমন ক'রে বলা যায় না যে সেটি যেমনটি তেমনটি হ'য়েই স্থির হ'য়ে রয়েছে "যেমনটি" এ কথার কোনও মানেই

নেই, যে দেখে, যখন দেখে, যেমন ক'রে দেখে, সেই অনুসারেই যেমনটি ভেসে বেড়াচ্ছে। বিশ্বময় এমনি একটা একাত্ম প্রাণবন্ধনের যোগ রয়েছে যে কাউকে ছেড়ে কারুরই সীমানা নির্দ্দেশ করা চলে না। বিজ্ঞান আজ এমন কথাও বল্‌ছে যে একগজ লাঠিখানাও সকল সময় একগজ থাকে না। লাঠিখানা স্থির আছে, কি জোরে চলছে, কে তাকে কোনখান থেকে কি ভাবে দেখ্‌ছে তার উপর লাঠির পরিমাণ নির্ভর করে। আমরা যে ঘরে ব'সে কথা বল্‌ছি এই কথার শব্দ যদি গ্রহান্তর থেকে শোনা যেত তবে আমার বক্তৃতার প্রথম ভাগ যে স্থানে উচ্চারিত হয়েছে তার মধ্যভাগ সেই স্থানেই উচ্চারিত হয়েছে ব'লে কেউ ভ্রম কর্‌ত না। অথচ এইখানে ব'সে এমন অসম্ভব কল্পনা করলে লোকে তাকে পাগল না ব'লে ছাড়ে না। এম্‌নি ক'রে দেখা যায় যে জানার সঙ্গে আর যা জানি তার সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চলেছে যে এ তুটিই পরস্পরের মিলনে পরস্পরকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নূতন থেকে নূতনতর হ'য়ে চলেছে। আমাদের সুখ তুঃখ ও ভাললাগা মন্দলাগা, সুন্দর অসুন্দর, ভালবাসা ও মন্দবাসা, আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, আমাদের শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, যা কিছু আমরা শ্রেয় এবং প্রেয় মনে করি, যা কিছু আমরা পাচ্ছি, পেয়েছি বা হারিয়েছি সবই যেন জীবনের ছন্দে "তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ" ক'রে নেচে চলেছে। আমাদের জানা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই বা আমরা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই, যেখানে সমস্ত বিষয়গুলি এসে আশ্রয় নেয়। রূপে গন্ধে, সত্যে কল্পনায়, হাসি কান্নায় যা সত্য, তা ক্রমশঃ আপনার রূপ অভিব্যক্ত কর্‌ছে, সে রূপ স্থির নয়, তা চঞ্চল। তাই এমন কিছু স্থির বস্তু নেই যা যথাস্থিতভাবে আমাদের জ্ঞানে এসে প্রতিফলিত হয়। যা দেখ্‌ছি যা অনুভব করি, সে সমস্তই আমাদের অনুভবের

সোণার কাঠির স্পর্শে পরিবর্ত্তিত হয় এবং আমাদের অনুভবের সোণার কাঠিটিও সর্ব্বদাই অষ্টধাতুতে পরিণত হ'য়ে চলেছে। এই মতটিকে idealism বলে। বাংলায় আমি একে পরিকল্পনাবিবর্ত্ত বা কল্পনা-বিবর্ত্ত বলতে চাই।

এই ছুইটি মতকে পাশ কাটিয়ে আর একটি দার্শনিক মতও কিছুদিন ধরে ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে উঠছে। সেটিকে আমি বল্‌ব অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ বা ব্যবহারিত্ববাদ (pragmatism)। এঁরা বলেন যে, সত্য আমরা তাকেই বলি যা আমরা কাজে খাটাতে পারি, বা যার অনুসারে আমরা আমাদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পন্ন করতে পারি। কোনও কাজ কর্‌তে গেলে, যা না বিশ্বাস করলে আমাদের চলে না বা অসুবিধা হয় সেইটাকেই সত্য ব'লে এঁরা মেনে নিতে চান। বিশ্বাস করাও এঁরা তাকেই বলেন যে অনুসারে আমরা কাজ করি। কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে যে চাঁটগাঁ যেতে চায় সে রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌লে বিশ্বাস করে আমরা তখনই বল্‌ব যখন আমরা দেখ্‌ব যে ভোরে ৭ টায় গাড়ী ধরবার জন্য তল্পিতল্পা বেঁধে সে যথাসময়ে শিয়ালদহের দিকে ছুট্‌ দিয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার আসরে বস্তুতান্ত্রিকতার চেয়ে এ মতেরও প্রভাব কম নয়। চর্‌কা ঘুরলে দেশের মঙ্গল হবে এটা যখন নিশ্চিত, তখন চর্‌কা ঘুরন সম্বন্ধে খণ্ড কি মহাকাব্য নিশ্চয়ই জ'মে উঠ্‌তে পারে, সে জন্য নবোদ্গতপক্ষ কবিদের এই বিষয়েই কাব্য লেখা উচিত। এ সম্বন্ধে ছুচারখানা কাব্য বেরিয়েছে এ কথাও আমি শুনেছি। ঋতু সম্বন্ধে বৃথা রসোদ্রেক করবার চেষ্টার চেয়ে যদি আমি লিখি—চর্‌খা ঘুমা ঘুমাকে চৌষট্‌ হাজার বাচা বাচাকে স্বরাজ লেঙ্গে, এটার কাব্যরস সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হওয়া উচিত নয় কারণ এতে এক ঢিলেই তিনটি পাখী মারা গেছে। প্রথমতঃ, এটা হিন্দীতে লেখা,

তার প্রথম ফল এই যে এটা সকলে বুঝবে; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীর চৌষট্টী হাজার টাকা এতে বাঁচান গেল; তৃতীয়তঃ, এতে চরকা ঘোরান গেল। এতগুণ সত্ত্বে কবিতাটির চতুর্থ চরণের অভাব মার্জ্জনীয় সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে pragmatic বিষয়ের অভাব নেই, যথা ধাঙ্গড়বিদ্রোহ, কলেরা, বসন্ত ম্যালেরিয়ানিবারণ, বন্যানিবারণ, দুর্ভিক্ষনিবারণ ইত্যাদি।

আজকালকার বাংলা সাহিত্যে যাঁরা realist বা যথাভূতবাদী তাঁরা মনে করেন যে যে বস্তুটি যেমন ক'রে আছে তাকে ঠিক সেই রকম ক'রে চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। সমাজের আবর্জ্জনা বা পাঁক, পাপ বা মলিনতা, দুর্দ্দম সংযমহীন ইন্দ্রিয়লোলুপতা এ সব জিনিষই ত রয়েছে। পূর্ব্বতন কবিরা এগুলিকে কাব্যের বিষয় করেন নি, কিন্তু না কর্‌বার ত কোন হেতু নেই, যেটি যেমন ক'রে আছে সেটি ত তেমন ক'রেই সত্যি। জঘন্যতা বা নিন্দনীয়তা ত মানুষের মনে, বস্তুর মধ্যে ত কোন নিন্দা প্রশংসা নেই। প্রাচীনেরা যদি জীর্ণ সংস্কারবশে কতকগুলি সত্যকে হেয় ও বর্জ্জনীয় মনে করেন, তাই ব'লে সেগুলি হেয় বা বর্জ্জনীয় হ'তে পারে না। এঁরা যথাস্থিতবাদী, সেই জন্যেই এঁরা বিশ্বাস করেন যে যেটি যেভাবে আছে সেই ভাবেই সেটি সত্য এবং কাব্যের বিষয় হবার যোগ্য। এঁদের মন্ত্র হচ্ছে এই যে স্বভাবে সুরুচি কুরুচি নেই, সুনীতি দুর্নীতি নেই, পাপপুণ্য নেই। এঁরা চান না যে কোন প্রাচীন সংস্কারের আদর্শের দ্বারা স্বভাবে যা রয়েছে তাকে ওলট্‌ পালট্‌ ক'রে দিয়ে পুরোণো ঢংএ গ'ড়ে তুলবেন, কারণ মনের কাজ শুধু যা আছে তাই দেখা, কাব্যেরও কাজ তাই যা আছে তাই চিত্রিত করা। ব্যবহারবাদীরা হয়ত বলেন যে কাব্য জিনিষটা কল্পনায় না রেখে সত্যকার কাজে লাগান উচিত। কাব্যরসের দ্বারা যখন লোকের

মন অভিষিক্ত হয়, তখন সেই মনকে এমন ক'রেই নরম ক'রে দেওয়া উচিত যাতে অনায়াসে সুতো কাটতে বা কাপড় বুনতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, অথবা ধাঙ্গড়দের দুঃখ দূর করতে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যথাস্থিতবাদিদের গোড়াকার বনেদে এই একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র আছে যে, যেমনটি যা আছে সেটি তার পূর্ব্বাপরকে নিয়ে এমন ভাবেই আছে যে সেখান থেকে তাকে ছিন্ন ক'রে কাব্যে চিত্রিত করবার জন্য মনের রঙে রঙিয়ে নিতে গেলেই যেমনটি আছে তেমনটি চিত্রিত করা সম্ভব হয় না। আর একটি ছিদ্র এই যে রস জিনিষটি মনের বা হৃদয়ের অনুভবের বস্তু। অথচ হর্ষ, শোক, ভয়, দৈন্য, দুঃখ প্রভৃতি যা কিছু আমরা লৌকিক জীবনে অনুভব করি এবং যাকে ইংরেজীতে বলা যায় emotion সেটা কাব্যরস নয়। কাব্যরসটা এইভাবে অলৌকিক যে emotionগুলি যেরূপ বহুল পরিমাণে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শরীরভোগ্য ও স্বার্থজড়িত, কাব্যরস তা নয়। কাব্যের শোকরসে লোকে কাঁদে বটে, কিন্তু সে শোকরসে লৌকিক শোকের দুঃসহতা নেই, কাজেই বাহ্যতঃ লৌকিক রসের সঙ্গে কাব্যরসের একটা আপাত-সাদৃশ্য আছে, এরকম মনে হ'লেও, লৌকিক রস থেকে এরস সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুরভি যেমন তৃণশষ্প আহরণ ক'রে তাকে আপনার মধ্যে এমন ক'রে পরিপাক করে যে সমস্ত তৃণশষ্পকে ক্ষীরধারায় পরিণত করে, কবিও তেমনি তাঁর সুনিপুণ অনুভবের চমৎকারিত্বের দ্বারা লৌকিক রসকে কাব্যরসরূপে সৃষ্টি করেন। যতই থিওরির জঞ্জাল থাক্ না কেন, এ কথার একটুও নড়চড় হবার যো নেই যে রসসৃষ্টি না হ'লে কিছুতেই কাব্য হয় না। এই রসসৃষ্টি জিনিষটা কিছুতেই যথাস্থিতের চিত্রণে সম্ভব হয় না, কারণ প্রাণের অনুভবের অন্তরালোড়নের পরিপাকেই এর সৃষ্টি। যেমনটি আছে, কাব্যরসে কখনই

ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না। যথাস্থিতবাদীরা যতই কৃতী হোন যদি তাঁরা কাব্যরসের স্থষ্টি করেন, তবে কিছুতেই তাঁরা যথাস্থিতবস্তুকে চিত্রিত কর্‌তে পারবেন না। দৈহিক ও প্রাকৃতিক আলম্বন উদ্দীপন ছাড়া রসস্থষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু তাই ব'লে যে emotionটি শুধু রক্তমাংসেই প'ড়ে থাকে, রক্তমাংসকে অতিক্রম ক'রে প্রেমের অলৌকিকতাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না, তাকে যথার্থ কাব্যরস বলা চলে না। সেইজন্য আমার মনে হয় যে নিছক সর্ব্বাঙ্গীণ realismএর দ্বারা কাব্যরসের স্থষ্টি হতে পারে না, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে কাব্যে realism থাকা সম্ভব নয়। যে কাব্যে প্রধানতঃ যথাস্থিত স্বভাববস্তুকে স্থান দেওয়া হয়, স্বভাবকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে সেই স্বভাবের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দরসের চমৎকারিত্ব কবির প্রাণকে স্পর্শ করে, স্বভাবের সমস্ত উপকরণসম্ভারের সেই স্পর্শটুকু কবি যখন বিতরণ করেন, তখন সেইখানেই আমরা কাব্যের realismএর পরিচয় পাই। অবশ্য চুলচেরা বিচার করতে গেলে কাব্যে realism সম্ভবই নয়, কারণ স্বভাবানুগত যে বস্তুরই বর্ণনা কবি করুন না কেন তার অলৌকিক রসানুভূতির স্পর্শটুকু না দিতে পারলে কিছুতেই কাব্যস্থষ্টি হয় না। অপর পক্ষে realismএর দিক থেকে একথা বলা চলে যে উপকরণসম্ভারের প্রাচুর্য্য না থাক্‌লে শূন্যের গলায় দড়ি দিয়ে শুধু পরিকল্পনার বলে কাব্য স্থষ্টি চলে না। প্রাচীন কাল হ'তে আমাদের দেশের কাব্য যে ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তা দেখলে মনে হয় যে যথাস্থিত স্বভাববর্ণনার প্রাধান্যেই আমাদের দেশের কাব্যের আরম্ভ। প্রকৃতির দিকে যখন আদি কবি বাল্মীকি চেয়ে দেখতেন, তখন প্রকৃতির নিছক আপন রূপটি বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করত। প্রকৃতির ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের ব্যাপারের যে একটা সাদৃশ্য আছে, বা প্রকৃতির ব্যাপার-গুলি মানুষের জীবনকে কি ভাবে পরিবর্তিত করে, বা কি ভাবে

মানুষের ভোগে বা উপকারে আসে, বা মানুষকে কি ভাবে প্রতিহত বা বিপর্য্যস্ত করে তার ছায়া বাল্মীকির কবিতায় যে নেই তা নয়, কিন্তু ক্ষীণ। কিন্তু দেখা যায় যে বাল্মীকির পরবর্ত্তী অনেক কবি ক্রমশঃই প্রকৃতির ব্যাপারের জন্য মানুষ কি ভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং তাদের নানাবিধ দৈনন্দিন ব্যাপার প্রকৃতির লীলা-বৈষম্যের দ্বারা কিরূপে প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই দিক হ'তেই প্রকৃতিকে বিশেষ ক'রে ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতিকে মানুষ যখন তার ব্যবহারের উপযোগিতার দিক হতে দেখে, তখন তাকে ব্যবহারিক অর্থক্রিয়ামূলক বা pragmatic বলা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে ব্যবহারিকতা বা pragmatismএর উপর নির্ভর করলে কাব্য জন্মে না, এবং সেই হিসাবে এই শ্রেণীর অনেকের কাব্য জমেওনি। কিন্তু অনেকেই আবার এই pragmatismএর ছায়াকে এত ক্ষীণ করেছেন যে তাতেক'রে কাব্যরসের আনন্দটি কুণ্ঠিত হয়নি। তৃতীয় স্তরে দেখা যায় যে কেউ বা pragmatism এর ব্যবহারিকতার অংশটি ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতি থেকে মানুষচরিত্রের নানা লীলাবৈষম্যে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। চতুর্থ স্তরে দেখা যায় যে কবি প্রকৃতির আনন্দে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে একেবারে অন্তর্লোকের দেদীপ্যমান শুভ্রজ্যোতি পুরুষের স্পর্শটুকু প্রকৃতির রসে রসাল ক'রে কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইখানেই কাব্যের পরিকল্পনাবিবর্ত্ত বা idealismএর চরম বিকাশ। প্রকৃতির উপকরণ সম্ভারমূলক যথাস্থিতবৃত্তিক realism হ'তে মানুষের চিত্ত এইরূপে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে কল্পনাবিবর্ত্তের বিমল স্বর্গে আরোহণ করে। ভারতবর্ষীয় বর্ষাকবিতা থেকে স্থানেস্থানে উদ্ধৃত ক'রে কাব্যে realism হ'তে idealismএ উঠবার ক্রমপদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করব।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে সীতাকে তিনি

উদ্ধার করে দেবেন কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে, একালে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব, তাই রামচন্দ্র বর্ষাবসানের প্রতীক্ষা করছেন। সীতাকে ছেড়ে রাম রয়েছেন, একদিকে এই বিরহ; অপরদিকে হৃতদার, হৃতরাজ্য রামচন্দ্র বর্ষাকালের প্রতিকূলতায় যুদ্ধযাত্রা করতে পারছেন না।

> অহন্তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
> নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ॥
> শোকশ্চ মম বিস্তার্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
> রাবণশ্চ মহাঞ্শত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে॥
> অযাত্রাং চৈব দৃষ্ট্বে মাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
> প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্॥

রামচন্দ্রের এমন বিরহ, এমন শোক, এমন বিপদ, অথচ এই বর্ষাকালে দীর্ঘদিনের পর সুগ্রীব তার [illegible] সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ করছে।

> অ[illegible]রিক্লি[illegible]দারৈঃ সমাগতম্।
> আত্মকার্য্যগরীয়[illegible]ঃ নেচ্ছামি বানরম্॥

চারিদিকের এই সমস্ত ঘট[illegible] বেশ একটি pragmatic atmosphereএনে দেয়। পরবর্ত্তী [illegible] হলে স্ত্রী কাছে থাকলে কি কি উপভোগ করা যেত, বর্ষাকা[illegible] কাছে না থাকলে তার কি দুঃখ, এ সম্বন্ধে অনেক কান্না কাঁদ[illegible] কিন্তু বাল্মীকির কবিতায় এই subjective reference বা pragmatic attitude অত্যন্ত ক্ষীণ। একবার মাত্র নীলমেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে সীতাহরণের সময় সীতা রাবণের কোলে এমনি করেই বুঝি ছটফট করেছিলেন :—

> নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
> স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী॥

মেঘের জলবর্ষণ দেখে তাঁর মনে হচ্চিল যে সীতাও বুঝি এমনি করেই বাষ্প বিসর্জ্জন করেছিলেন :—

এষা ধর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥

কিন্তু বৃষ্টি দেখে সীতার কথা এভাবে স্মরণ হওয়াতে কোনরূপ ব্যবহারিকতার ছায়া নেই। কেবলমাত্র নিজের দিক্ দিয়ে (subjective referenceএ) একটু স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতি যে শুধু সীতা সম্বন্ধেই ঘটেছিল তা নয়, রামচন্দ্রের পূর্ব্বজীবনের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গেও বর্ষার তুলনা করে এইরূপ স্মৃতিবর্ণনার উদাহরণ পাওয়া যায়। একস্থানে রাম বলছেন যে পর্ব্বতগুলি যেন মেঘের কৃষ্ণ অজিন পরে ও বৃষ্টিধারার উপবীত গলায় দিয়ে ব্রহ্মচারিদের মত গুহা প্রতিধ্বনিত করে বেদপাঠ করছেন। আবার অন্যত্র তিনি বলছেন যে আকাশের গায়ে কে যেন বিদ্যুতের সোণার চাবুক মারছে, আর তারি আঘাতে আকাশ বেদনাতুর হয়ে গর্জ্জন করে উঠচে :—

মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতপূরিতগুহা প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ ॥
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিত নির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্ ॥

কিন্তু এ ছাড়া সাধারণতঃ তাঁর গোটা বর্ষাবর্ণনাটাই নিছক বর্ষাকালের প্রকৃতির বর্ণনা, ফলফুলের বর্ণনা, পশুপক্ষীর বর্ণনা। আর গরম নেই, ধূলা নেই, বাতাস সিক্ত, পথঘাটে কাদা, গাড়ী চালাবার উপায় নেই, আকাশের কোনও স্থল পরিষ্কার, কোনও স্থল মলিন, চারিদিকে ছিন্ন মেঘ, কখনও বা আকাশ দেখতে শান্ত সমুদ্রের মত—

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥

গৈরিক পাহাড়ের রং‌এ অরুণিত জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ছে আর তার সঙ্গে শাল আর কদম ফুল ভেসে আসছে। চারিদিকে তরুণ ঘাস উঠেচে। নদী, পুকুর, দীঘি, পৃথিবী সমস্ত জলে ভেসে যাচ্ছে। জোরে বাতাস বইচে, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলিপ্ত, বড় বড় পাহাড়ের মতন মেঘগুলি দাঁড়িয়ে রয়েচে, পাহাড়ের শিখরগুলি জলবিধৌত হয়ে আরও উচ্চতর দেখাচ্চে। নীলমেঘের গায়ে নীলমেঘ লেগে রয়েচে, বড় বড় জামের গাছে পাকা পাকা কাল জামগুলি ভ্রমরের মত ঝুলে রয়েচে, কোনকোনও স্থানে বা ঝড়ে চ্যুতবৃন্ত আমগুলি গাছের তলায় লোটাচ্ছে। সমস্তদিন বর্ষণের পর বৈকালের দিকে মেঘগুলি ভার হয়ে রয়েচে। হস্তীর মত গর্জ্জন করতে করতে বলাকার মালা গলায় দিয়ে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিশ্রাম করে মেঘগুলি আকাশপথে তাদের দীর্ঘ অভিযান আরম্ভ করেছে।

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসংনিকাশাঃ।
গর্জ্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥
মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তি সংমোদিতা ভাতি বলাকপঙ্‌ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী লম্বেব মালারুচিরাম্বরস্য॥

আবার বনে বনে কদম্বফুল ফুটেছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়েছে এবং ময়ূরেরা কেকাধ্বনির সঙ্গে নৃত্য করছে। কেতকী ফুলের গন্ধে হাতীগুলি মদমত্ত হয়ে উঠেছে, আবার জলধারার আঘাতে মধুমাতাল ভ্রমরের মত্ততা দূর হচ্চে, ক্রীড়ামত্ত সুরাঙ্গনাদের মুক্তার হার ছিঁড়ে গিয়ে বৃষ্টি-ধারা হয়ে পড়চে, পাতার উপর মুক্তার মতন টলটলে জল পাখীরা

পান করচে, মেঘের মৃদঙ্গনিনাদের সঙ্গে ময়ূরের কেকাধ্বনি ও ভেকের কণ্ঠতাল যুক্ত হয়ে সমস্ত বনস্থলীকে যেন সঙ্গীতের সঙ্গত করে তুলেচে, আর সেই সঙ্গতে বিচিত্র বর্ণালঙ্কৃত ময়ূরীরা নৃত্য আরম্ভ করছে। আকাশে তারাও দেখা যায় না সূর্য্যও দেখা যায় না, সুধু অবিশ্রান্ত বর্ষণ হচ্চে।

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা তমোবলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥
মত্তাগজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রা।
রম্যানগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রা প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ।
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তা প্রিয়াবিহীনা শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ॥

এমনি ক'রে আমরা দেখতে পাই যে আদি কবি বাল্মীকির রচনায় যথাস্থিতবস্তুবিষয়ক realismএরই প্রাধান্য অথচ এই realismএর মধ্য দিয়ে বর্ষার সৌন্দর্য্য তাঁর প্রাণে যে হর্ষস্পর্শের ঝঙ্কার তুলেছে, তাঁর কাব্যের প্রতি অক্ষরে তা ফুটে উঠেছে। আদি কবিগুরুর শিষ্যানুশিষ্য ভবভূতিও মালতীমাধবের ৯ম অঙ্কে বর্ষা বর্ণনায় কবি গুরুকে অনুবর্ত্তন ক'রে এই realismএর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন :—কুঞ্জঘেরা সরোবরের ধারে বেতের ফুল ফুটেছে, জুঁইএর বনের গন্ধে বাতাস হাই তুলছে, কুটজ ফুল পাহাড়ের গায়ে গায়ে হেসে ঝ'রে পড়ছে আর মেঘেরা ময়ূরদের নাচিয়ে তুল্‌ছে। পাহাড়ের গা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে, তার পাশে ফলভারপরিণামশ্যাম জম্বুবন, নীল রংএর নূতন মেঘ তার গা আশ্রয় করে রয়েচে। সাঁ সাঁ শব্দে ঝড় অর্জ্জুন আর শালের ফুল উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, ইন্দ্রনীলের মতন চিকণ কাল মেঘ শ্রেণী বেঁধে আকাশে ছুলছে, নূতন জলধারার ভেজা গন্ধে পুরাতন গ্রীষ্মকালের দিনগুলি সরে গিয়ে নূতন শোভা পৃথিবীতে

ব্যাপ্ত হয়েছে। ভবভূতির বর্ণনায় বিষয়ের তত জোর না থাকলেও শব্দ ও ছন্দের ঝঙ্কার ঠিক বর্ষাকালের মতনই গম্ভীর :—

বাণীরপ্রনবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ।
পর্য্যন্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ॥
উন্মীলৎকুটজ প্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ
প্রাগ্‌ভারেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে॥
জৃম্ভাজর্জরডম্বরঘনশ্রীমৎকদম্বদ্রুমাঃ।
শৈলাভোগভুবো ভবন্তি ককুভঃ কাদম্বিনীশ্যামলাঃ।
উদ্যৎকন্দলকান্তকেতকভৃতঃ কচ্ছা
সরিচ্ছ্রোতসামাবির্গন্ধশিলীন্ধ্রলোধ্রকুসুমস্মেরা বনানাং ততিঃ॥

অন্যান্য অনেক কবিও এঁদের পথানুবর্ত্তী হ'য়ে এই রকম যথাবদ্বস্তু-বর্ণনার দিক দিয়ে বর্ষাঋতুকে সম্ভোগ করবার চেষ্টা করেছেন। কবি যোগেশ্বর বল্‌ছেন, ধারাবর্ষার পর অতি ধীরে বায়ু বইছে, আকাশ মেঘে ঢাকা, চন্দ্রতারা ঘুমিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় এদিক ওদিক একটু আধটু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতি এমন শান্ত যে বেঙের ডাক অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়্‌ছে আর কদম্ব রেণু-ধোয়া বাতাসের গন্ধ চারিদিক ব্যাপ্ত কর্‌ছে, বিরহীরা কেমন ক'রে এমন রাতগুলি কাটায়—

আসারান্তমৃদুপ্রবৃত্তমরুতো মেঘোপলিপ্তাম্বরাঃ
বিদ্যুৎপাতমুহূর্ত্তদৃষ্টককুভঃ সুপ্তেন্দুতারাগ্রহাঃ।
ধারাক্লিন্নকদম্বসম্ভৃতসুরামোদোদ্বহাঃ প্রোষিতৈঃ
নিঃসম্পাতবিসারিদর্দুররবা নীতাঃ কথং রাত্রয়ঃ।

বাতোক কবি বল্‌ছেন যে এমন জোরে বর্ষা চলেছে যে মদমত্ত হস্তীর গর্জ্জনের মতন মেঘগর্জ্জনের দ্বারা সকলের মন একেবারে এমন নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ছে যে দিগ্‌বধূদের কোলে সূর্য্য চন্দ্রের দুই চোখ বুজে আকাশ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ছে।

এতস্মিন্মদজর্জ্জরৈরুপচিতে কম্বুরবাড়ম্বরৈঃ।
স্তৈমিত্যং মনসো দিশত্যনিভৃতং ধারারবে মূর্চ্ছতি ॥
উৎসঙ্গে ককুভো বিধায় রসিতৈরম্ভোমুচাং ঘোরয়ন্
মন্যে মুদ্রিতচন্দ্রসূর্য্যনয়নং ব্যোমাপি নিদ্রায়তে ॥

আর একজন কবি বল্‌ছেন যে কেতকী ফুলের ধূলি গায়ে মেখে বলাকাবলির শাদা কাপড়ে ঢাকা মড়া মাথায় নিয়ে নীল মেঘের জটায় জটিল হয়ে বিদ্যুতের ধনু খড়্গ ধারণ ক'রে বিরহিনীদের বধ করবার জন্য এ কোন্ কাপালিক এসে উপস্থিত হ'ল।

অভিনন্দ কবি বল্‌ছেন যে ভীষণ ঘনান্ধকার বিদ্যুতে মধ্যে মধ্যে ছড়ে যাচ্ছে; কাছের গাছটিকে পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, খালি জোনাকি দ্বারা অনুমান করে নিতে পারা যায়; ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানে রাত্রি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌ছে।

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃ স্তোমান্তরাঃ সন্তত
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্ বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি
গম্ভীরতামাসারোদকমত্তকীটপটলীক্বানোত্তরা রাত্রয়ঃ ॥

কিন্তু ভারতবর্ষীয় চিত্ত কোমলস্পর্শী, তাই এদেশের বর্ষা বর্ণনার মধ্যে যে realism দেখতে পাওয়া যায় তা প্রায়শঃই বর্ষার প্রসন্নতা স্তিমিততা বা সৌন্দর্য্যকেই বিশেষভাবে বরণ ক'রে নিয়েছে। উদ্দাম ঝড় বর্ষার যে ভীষণ প্রচণ্ডতার বর্ণনা আমরা মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় কবিতায় দেখতে পাই, ভারতবর্ষীয় কবিতায় সেরূপ প্রচণ্ডতার realism প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন, Burnsএর Brigs of Ayr :—

'When heavy, dark, continued, a'-day rains
Wi' deepening deluges o'erflow the plains ,

When from the hills where springs the brawling Coil,
Or stately Lugar's mossy fountains boil,...
Aroused by blustering winds and spotting thowes,
In many a torrent down the snaw-broo rowes.
While crashing ice, borne on the roaring spate,,
Sweeps dams, an' mills, an' brigs, a' to the gate,
And, from Glenbuck down to the Ratton-key,
Auld Ayr is just one lengthened tumbling sea', etc

অথবা যেমন Thomsonএর The Seasons কবিতায় :—

First, joyless rains obscure
Dry through the mingling skies with vapour foul,
Dash on the mountain's brow, and shake the woods
That grumbling wave below. The unsightly playing
Lies a brown deluge,—as the low-bent clouds
Pour flood on flood, yet unexhausted still
Combine, and deepening into night shut up
The day's fair face ;...
At last the roused up river pours along
Resistless, roaring ; dreadful down it comes
From the rude mountain and the mossy wild,
Tumbling through rocks abrupt, and sounding far ;
Then o'er the sanded valley floating spreads,
Calm, sluggish, silent ;...
Then issues forth the storm with burst
And hurls the whole precipitated air
Down in torrent. On the passive main

Descends the ethereal force, and with strong gust
Turns from its bottom the discoloured deep,
Through the black night that sits immense around,
Lashed into foam, the fierce conflicting brine
Seems o'er a thousand raging waves to burn.
Meantime the mountain-billows, to the clouds
In dreadful tumult swelled, surge above surge,
Burst into chaos with tremendous roar,
And anchored navies from their stations drive
Wild as the winds across the howling waste
Of mighty waters.

কালিদাসের বর্ষা কবিতার বৈচিত্র্য দুই এক কথায় সারবার নয়, অনায়াসেই কোন সুলেখক তাঁর বর্ষা কবিতার উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থিকা রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই, তাই দুই একটি কথা বলা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। কালিদাসের বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকির realismএর চেয়ে আমরা আরও অনেকখানি উঁচু ধাপে উঠে দাঁড়াই। একদিকে যেমন তিনি বর্ষা প্রকৃতির স্বভাব বর্ণনা করেছেন, বর্ষাতে প্রকৃতি কেমন সুন্দর হয় তা বর্ণনা করেছেন, তেমনি বর্ষা মানুষের চিত্তকে কেমন ক'রে নূতন নূতন রেশে প্রভাবিত ক'রে তোলে তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরি কাব্যে আমরা প্রথম দেখতে পাই যে বর্ষা ঋতু বা মেঘ শুধু ঋতু নয়, সে একটি ঋতু-পুরুষ। এই ঋতু-পুরুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা গভীর সৌহার্দ্য ও প্রীতির বন্ধন আছে, তা কালিদাস মেঘদূতে স্পষ্ট ক'রেই দেখিয়েছেন। রামগিরির যক্ষ বিরহাতুর হৃদয়ে দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী হ'য়ে কুটজ কুসুমে অর্ঘ্য রচনা ক'রে,

বন্দনা ক'রে, সন্তপ্তের শরণ মেঘকে বন্ধুত্বে বরণ ক'রে তার বিরহের বার্ত্তা এই মর্ত্তলোক থেকে সেই দূরের অলকাপুরীতে প্রেরণ করেছিল। মর্ত্তের যা বন্ধন তা কালিদাস কোন কাব্যেই অস্বীকার করেন নি কিন্তু মর্ত্তের বন্ধন থেকে যে আমরা অমৃতে পৌছতে পারি, মর্ত্ত থেকে আমাদের যে প্রেম সুরু হয়, তা যে অমৃত পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছয়, একথা কালিদাস তাঁর অনেক কাব্যেই আমাদের বলেছেন। বর্ষাকালে মানুষের মন পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে, একথা কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক কবিই বলেছেন, কিন্তু মানুষের প্রেম যে এমন অক্ষয়, অমর যা জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদক রামগিরি হতে নিত্যপ্রেমের, নিত্যনবযৌবনের, নিত্যজ্যোৎস্নাময় অলকাপুরী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং বর্ষা ঋতু যে ভাইয়ের মতন, দেবরের মতন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মিলন সঙ্ঘটন ক'রে দেয় এই idealismটি সকল ভাষায়, সকল কাব্যে নূতন। শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যে সংযমের দ্বারা ভোগাতীত মিলনকে পাওয়া যায় এ কথা কালিদাস আমাদের বলেছেন। কিন্তু, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দৌত্যে, সখিত্বে যে, বিরহী বিরহিণীর মিলনাতুর হৃদয় অশরীরী প্রেমে মিলিত হয়, এইটিই মেঘদূতের শিক্ষা। কালিদাস অন্তর্বৃত্তির পরিকল্পনা বিবর্ত্তে যে বর্ষাঋতুকে শুধু প্রাণময় ক'রে দেখেছিলেন, তা নয়, মিলনাতুর হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন যে এই ঋতুপুরুষকে স্নেহসিক্ত ক'রে তুল্‌তে পারে এবং এই ঋতুপুরুষের দ্বারা আমরা যে আমাদের বিরহের গানকে আমাদের প্রিয়জনের নিকট পাঠাতে পারি এই কথাটি কালিদাস সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যান, তখন তরু লতারা স্নেহবিগলিত হ'য়ে তাকে উপহার দিয়েছিল, সেই-ব্যাপার থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতিচিত্ত ও মানবচিত্তের ভিতর একটি সহানুভূতির বন্ধন আছে। সে সহানুভূতি যে সত্যই কত

গভীর হ'তে পারে তা আমরা মেঘদূতে বুঝতে পারি। প্রকৃতি মূক নিঃশব্দ তবু সে মানুষের দুঃখ বোঝে, মানুষের বন্ধু হ'য়ে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করে। তাই মেঘদূতের উপান্ত শ্লোকে কালিদাস বলছেন যে, হে মেঘ, তুমি নিঃশব্দ হ'য়ে চাতককে জল দাও, তাই নিঃশব্দ হ'য়ে আছ ব'লে আমার বন্ধুকার্য্য যে করবে না এমন কথা আমি মনে করতে পারি না।

কচ্চিৎসৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি
নিঃশব্দোহপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব

অন্তিম শ্লোকে তিনি বলছেন যে, হে মেঘ, তোমার কখনও যেন বিদ্যুৎপত্নীবিরহ না হয়। বন্ধুত্বের অনুরোধেই হোক, কৃপার অনুরোধেই হোক, বা আমাকে আর্ত্ত দেখেই হোক, তুমি আমার এই দৌত্য সম্পাদন ক'রে তারপর তোমার যথেচ্ছ দেশে যেতে পার। ঋতুপুরুষকে কালিদাস যে সম্পূর্ণ সজীব ও সচেতন ক'রে দেখেছিলেন, তা তাঁর মেঘদূতের প্রতি ছত্রে বোঝা যায়। এই ঋতুপুরুষ শুধু যে মানুষের সুহৃৎ বন্ধু ও সখা তা নয়, সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এই ঋতুপুরুষের যে চেতনপুরুষের মত আনন্দ সম্ভোগের লীলা চলেছে, প্রকৃতির হৃদয়ে চক্ষু রেখে তা কালিদাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি মেঘদূতকে পথ দেখাবার সময়ে তার দৌত্য-যাত্রার পথে নানা মনোবিলোভন ব্যাপার বর্ণনা ক'রে মেঘকে উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন। কালিদাসের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না, কিন্তু আজ আর বলা চলে না।

কালিদাসের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের idealism দেখতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে সেরূপ idealism আর কোন কবির মধ্যেই

তেমন ক'রে দেখা যায় না। তুলসীদাস একজন বড় কবি, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত ভক্ত, তাই একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতিকে যথাবৎ ভাবে বর্ণনা ক'রতে ভালবাসতেন, অপর দিকে তাঁর idealism ছিল এই ধরণের যে তিনি সর্ব্বদাই প্রকৃতি থেকে উপদেশ পাবার চেষ্টা করতেন। যথা :—

ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা।
দামিনী দমকী রহী ঘন মাহী খলকি প্রীতি যথা থির নাহি।
বরষহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে যথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে।
বুঁদ অঘাত সহৈ গিরি কৈসে খলকে বচন সন্ত সহ জৈসে।
ভূমি পরতভা ডাবর পানি জিমি জীবহিঁ মায়া লপুটনী।

বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে বর্ষার realistic বর্ণনা বেশ সুন্দর দেখা যায়, যেমন :—

গগনে অবঘন মেঘ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন পবন খরতর বলগই

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে পন্থ হেরই মোর।

আবার

ঝরঝর বরিষ সঘন জলধার দশদিশ সবহুঁ তেহ আঁধিয়ার
এ সহি কিয়ে করব পরকার অবজনু বাবয়ে হরি অভিসার..
ঝলকই দামিনী দহন সমান ঝন্‌ঝন্ শব্দ কুলিশ ঝনঝান্
ঘরমহি রহত রহই ন পার কি করবই সব বিঘিনি বিথার

আবার

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম কুলিশ পড়য়ে দুরবার
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন সংশয় পড় অভিসার

আবার

কাজরে সাজলি রাতি ঘন ভৈ বরিষয়ে জলধর পাঁতি
বরিষ পয়োধর ধার দুরপথ গমন কঠিন অভিসার
যমুনা ভয়াউনি নীরে আরতি ধসতি পাউতি নহি তীরে
বিজুরি তরঙ্গে ডরাই তোঁ-ভল কর জোঁ পলটি ঘর যাই
ঝাঁখতি দেব বনমালী এহি নিশি কোনে পরি আউতি গোয়ালী

আবার

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের বর্ষা বর্ণনাও অনেকটা বিদ্যাপতিরই মতন; যথা :—

ঝর ঝর জলধর ধার, ঝঞ্ঝা পবন বিথার,
ঝলকত দামিনী মালা, ঝামরি ভৈ গেল বালা;
ঝাঁপি রহত দুঁহু কাণ ঝন ঝন বজর নিশান;
ঝিঞ্ঝিরি ঝঙ্কর রাতি ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি ইত্যাদি

এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে বর্ষাঋতুর বর্ষণের দিকটা সুন্দর শব্দযোগে সুন্দর ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বর্ষার বর্ষণটি কৃষ্ণরাধার আলম্বন উদ্দীপন রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ষাঋতুতে স্ত্রী পুরুষ মিলনের জন্য সমুৎসুক হয়, ঘনান্ধকারে যখন অভিসারিকারা নায়কের কাছে যায় তখন মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎঝলকে তারা আপন পথ দেখে নেয়। এ সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের অতি প্রাচীন মামুলী বর্ণনা। সেই হিসাব থেকে এই বর্ষা ঋতুতে কৃষ্ণের জন্য রাধার যে উৎকণ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে, বা রাধার অভিসারের পথে যে সমস্ত বিঘ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, সে অংশে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতিতে কোন নূতনত্ব নেই। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই মিলনোৎকণ্ঠাকে এমন চমৎকার আবেগের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন যে শব্দ-ঝঙ্কারের সহযোগে, নূতন না হ'লেও, তা অতি নূতনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং দ্রবীভূত করে।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের ঘরোয়া কবিতায় অনেক সময়ে বর্ষাঋতুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন অতি সুন্দরভাবে realistic অপরদিকে তেমনি স্ত্রী-পুরুষের মিলনাতুর চিত্তের উৎকণ্ঠায় ভরপূর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৈমনসিংহ গীতিকার কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যান হ'তে একটু উদ্ধৃত ক'রে দেখান যেতে পারে।

আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা সম্ভাষণে॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা॥
হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন ববষা জলে বসুমাতা ভাসে॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া॥
শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী॥

আবার

কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ুর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা॥
জলেতে কলম ফুটে আর নদী কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল॥

দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি ॥
খাউরি বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ॥
রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর ॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী ॥
শাউনিয়া ধায় শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে ॥

পরবর্ত্তী বাংলা কবিদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তই বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ষায় গ্রীষ্মের যে গুমোট হয় তার বর্ণনা করেছেন, গ্রীষ্মের সঙ্গে লড়াই ক'রে বর্ষা কেমন ক'রে তার বিক্রম বিস্তার করে তার বেশ realistic বর্ণনা দিয়েছেন, খুব ঝমাঝম বর্ষার বর্ণনা দিয়েছেন, খুব বর্ষা হবার পর চারিদিক কেমন শীতল হ'য়ে যায় তারও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলি একদিকে যেমন realistic, অপরদিকে তেমনি pragmatic, অর্থাৎ বর্ষাকালে কেমন ছারপোকা হয়, মশা হয়, বর্ষাকালে সাহেবরা কি করে, বাঙালীরা কি করে, মুসলমানেরা কি করে এর কোন কথাই তিনি বলতে ছাড়েন নি।

কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা,
দুই কালে বন্ধু দুইজন ;
শয্যায় ভার্য্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।

কিন্তু এসত্বেও ঈশ্বরগুপ্তের বর্ণনার মধ্যে নানাস্থানে চমৎকারিত্ব আছে।

কিন্তু কালিদাসের পরই রবীন্দ্রনাথ বর্ষার চরম কবি। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতার একটা মোটামুটি সমালোচনাও এতটুকু প্রবন্ধে করবার উপায় নেই। Realism থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ idealismএর চরমে উঠেছেন। সে idealism কালিদাস থেকে আরম্ভ ক'রে কালিদাসকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। ঝর ঝর ক'রে বর্ষা ঝরছে—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।

আবার

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ বাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

আবার

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত
থর থর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্
বরখত নীরদ পুঞ্জ,
শাল পিয়ালে তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

মেঘ করে আসছে,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে

জোরে বর্ষা নেমে আসছে

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে,
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য সরিয়ে রেখে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদলের সভায় নিজেকে আহুত ক'রে সেই সভার মুখপাত্র হয়ে বর্ষাকে অভিনন্দিত করছেন

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা

তাই তিনি সেই প্রাচীন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন

যূথী পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে,
জাগ সহচরী আজিকার নিশি ভুলনা
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।

কিন্তু বর্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে দৃষ্টি সেটা তাঁর ঠিক

স্বভাবগত নয়। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির বর্ষা থেকে, প্রকৃতির অন্ধকার থেকে অন্তরের রসসিক্ত বর্ষায়, অন্তরের নিভৃত গিরিগুহায় প্রত্যাবর্ত্তন। বর্ষা দেখে তাঁর প্রাণ আপনি আপনি নৃত্য ক'রে ওঠে, সে নৃত্যের ছন্দ ও গানের সন্ধান তা'তে পাওয়া যাবে যে ছন্দে ময়ূর তার কেকাধ্বনি করে, নৃত্য করে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শিশু, তাই প্রকৃতির বর্ষণধারায় তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ।

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বর্ণের ভাবউচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে।
নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকসিত প্রাণ জেগেছে,
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

বর্ষায় যে প্রিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে কথা বলার একটা আনন্দ আছে, সে সম্বন্ধে কবির দুটি একটি কবিতা আছে, যেমন :—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরষায়।

এমন মেঘ স্বরে বাদল ঝর ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।
* * * *
সে কথা শুনিবে না কেহ আর ;
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
* * * *
ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরষায়।

কিন্তু বর্ষা ঋতু রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিরহ জাগায় সেটি অধিক স্থলেই প্রিয়ার নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের। কালিদাস যে বিরহটি প্রিয় ও প্রিয়ার অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গ'ড়ে তুলেছিলেন, বর্ষাকালের যে বিরহ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ তরুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ তরুণীর সম্পর্ক বর্জ্জন ক'রে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধরা ছোঁয়া যায় না এমন যে একটি অশরীরী আকিঞ্চন আছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। ঝম্ ঝমে একঘেয়ে বৃষ্টির ধারা তাঁর মনের তারকে পিড়িং পিড়িং ক'রে সেই একই তারে সর্ব্বদা বাজায়—

বাদল বাউল বাজায়রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝরে ঝর ঝর ধারা,
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।

ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।

বাদলের ছোঁয়ায় তাঁর প্রাণের মরুভূমি সবুজে পূর্ণ হয়ে যায়—

কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে

* * *

ওরা যে এই প্রাণের বনে মরু জয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

ঝড়ের তালে তাঁর দুটি চোখ সজল হ'য়ে যায়, হৃদয়ে ব্যথার তুফান ওঠে—

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে,
আঁচলখানি দোলে।

* * .

ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে;
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যাথার তুফান তোলে।

বনের বীণার সুরে—

মন যে আমার পথ হারান সুরে,
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

নবীন মেঘের সুরে তিনি নিরুদ্দেশ পথে হারিয়ে যান,—

নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
ভাবনা যত উতল হল অকারণে।

* * *

সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস লোকের গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে।

শ্রাবণমেঘের দরজা দিয়ে তিনি তাঁর পথ-ভোলা অতিথিকে দেখতে পান, যে অতিথি তাঁর মনের মধ্যে ব'সে সর্ব্বক্ষণ সুরের জাল বুনছে—

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ ভোলা।
*   *   *   *
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।

বর্ষায় কবির কোন্ চিত্তবিহারীর বিরহব্যথা বাদলধারার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে—

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

নিশীথ রাত্রির বাদল ধারায় কবি এই প্রাণের আকিঞ্চনে নিদ্রাহারা হ'য়ে অন্তরের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, গোপন ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় ব্যথায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসহে গোপনে।
*   *   *

যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে,
নিয়োগো নিয়োগো
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে ;
দিয়োগো দিয়োগো
চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

* * *

কবির বর্ষা কবিতাগুলি একটার পর আর একটা যতই আমরা প'ড়ে যাই ততই দেখতে পাই যে বর্ষার জলধারার আঘাতে আঘাতে তাঁর সমস্ত অন্তর যেন কোন্ হৃদয়বিহারী প্রিয়তমের বিরহে কখনও বা যেন নিঝুম হ'য়ে পড়ছে, কখনও বা যেন সুরে সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে, কখনও বা যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

এই বিরহের সুর ছাড়া আর একটা ভাবধারা কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা তাঁর নূতন কাব্য ঋতুরঙ্গে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কোথাও নয়। কালিদাসের কাছে ঋতু ছিলেন বন্ধু, ঋতু ছিলেন সখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিতরবাহির উভয় প্রাঙ্গণ জুড়ে সেই পরমমঙ্গলময় নটরাজের লীলানৃত্য চলেছে। তাই ঋতুর তালে তালে আমাদের চিত্ত নেচে ওঠে, তাই প্রতি ঋতু তার পদের অলক্তকচিহ্ন আমাদের হৃদয়ে রেখে যায়। এই দিক্ থেকে দেখতে পাই যে বর্ষাঋতু—সে সুধু ঋতু নয়, সে নটরাজের এক রূপ, সে ঋতুপুরুষ। সেই ঋতুপুরুষের লীলা বর্ণনাই ঋতুরঙ্গ লীলানাট্যের বিষয়। এ বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা আর এই প্রবন্ধে চল্‌তে পারে না। কিন্তু এই ঋতুরঙ্গের মধ্যে যে ভাবটি দেখা যায় সেটা কবির অন্য ধারাতে একটি সম্পূর্ণ ধারা। এ ধারাটি হচ্ছে সেই

ধারা যাতে কবির চিত্ত তাঁর আপন অন্তরের অন্বেষণে যা পান নি ভিতর ও বাহিরের মিলনে যে আনন্দলীলা চলেছে সেখানে তাঁকে পেয়েছেন। এই লীলায় আত্মপ্রাপ্তি যথার্থ আত্মপ্রাপ্তির লীলা।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণপবনপরশে
সরস্বতীর মানসসরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয়নির্ব্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্পপরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি বা চরিত্রবিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেগুলিকে সুনির্ব্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যাসমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। উপন্যাসের ঐক্য অনেকটা আল্‌গা ধরণের, ইহার তন্তুগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে; এই ফাঁকগুলি ঔপন্যাসিক অনেক সময় গল্পবহির্ভূত প্রসঙ্গ বা মন্তব্যের দ্বারা পূরণ করিতে পারেন। ছোটগল্প-লেখকের ভাগ্যে এই সমস্ত সুযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বঙ্গ সাহিত্যে ছোটগল্পের আপেক্ষিক মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা যেরূপ সঙ্কীর্ণ-পরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতোবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোট গল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকাপ্রোথিত শীর্ণকলেবর জলধারার মতই দেখায়। এই স্বাভাবিক রসদৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই আমাদের উপন্যাসের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা বিরাট ফাঁকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বক্তব্য বিষয়ের গুরুতর অভাব যেন লেখককে একটা শূন্যগভ অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বক্তব্যের অভাব মন্তব্যের প্রাচুর্য্য বা অনাবশ্যক দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ফল কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোট গল্পের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যতটুকু মাধুর্য্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সুতরাং আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার সহিত ছোট গল্পের একটি বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। এবিষয়ে ইউরোপীয় ছোট গল্পের সহিত আমাদের একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে জীবনধারার এমন একটি সহজ ও প্রচুর প্রবাহ, এমন একটি দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ আছে, যে, ইহা উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিকেও ছাপাইয়া যাইতে চাহে। পাশ্চাত্য জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলি এত সুদূরপ্রসারী, তাহাদের ঘাতপ্রতিঘাত এতই বিচিত্র ও জটিল; তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত, যে, ছোট গল্পের মধ্যে

সেগুলির স্থানসঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ ছোট গল্পের মধ্যে স্থান লাভ করে তাহা প্রায়ই গৌণ ও অপ্রধান। জীবনের কেন্দ্রস্থ গভীর ভাব ও অনুভূতি গুলিকে ছাড়িয়া, তাহার লঘুতর বিকাশগুলি, তাহার সীমান্তপ্রদেশের গৌণ বৈচিত্র্যগুলিকে লইয়াই তাহার কারবার। চটুল সরসতা, জীবনের বিস্ময়কর, আশ্চর্য্য সংঘটনসমূহ, তাহার হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিগুলিই সাধারণতঃ ইউরোপীয় ছোট গল্পের বিষয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতে ইহার বিপরীত ব্যাপার। তাঁহার দুই একটি গল্পে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা, সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও রহস্যময় সূত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে। আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে মরুভূমির বিশাল ধূসর বালুকাবিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি সেখানেও সেই সর্ব্বদেশসাধারণ ভাবমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া, বাহ্য-বিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তব জগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাবসম্পদ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে, যে, আমাদের বিষয়দৈন্য ও

বৈচিত্র্যহীনতার জন্য আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির।

আমাদের সামাজিক জীবনের বদ্ধ গলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বহাইয়াছেন, তাহা যেমনি সহজ তেমনি আশ্চর্য্যরূপ ফলপ্রদ। তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা এই চারিটি উপায়ের বৈধতা ও কার্য্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রেম; একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, Love is the solar passion of the race—প্রেমই মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রেমই অতি সাধারণ জীবনে একটা বিপুল শক্তিবেগ, প্রবল ধ্বংসকারী উন্মত্তত' ও দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সঞ্চার করিয়া ইহাকে রোমান্সের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তোলে, তুচ্ছতম জীবনের উপরে একটা বৃহৎ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আনিয়া দেয়। প্রেমের উন্মাদনা জীবনকে তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে টানিয়া আনিয়া বাহিরের বিশ্ব-জগতের সহিত একটি নিগূঢ় সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ করে; হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল আবেগকে, সুপ্ত কল্পনাবৃত্তিগুলিকে মুক্তি দিয়া, ও মানব-মনের অতর্কিত, অলক্ষিত পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তার সৃষ্টি করে। কবিরা প্রেমের এই দুর্ব্বার শক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার স্তবগান করিয়াছেন, ঔপন্যাসিকেরাও ইহার গূঢ়

প্রভাব ও প্রক্রিয়া মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্যজগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটি বৃহৎ দুঃখে অভিষিক্ত করে ও মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে-সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্ত্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধানতঃ কবিত্বময়, গীতিকাব্যের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। ঔপন্যাসিকের যে প্রধান কর্ত্তব্য মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, তাহা ইহাদের মধ্যে সেরূপ পরিস্ফুট নহে। 'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্য্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতেও প্রধান আকর্ষণ—গিরিবালার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য ও তাহার অতৃপ্ত-যৌবন-চঞ্চল রক্তলহরীর উপর রঙ্গমঞ্চের যাদুময় প্রভাব বর্ণনাতে—উহার গল্পাংশে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। 'দুরাশা' গল্পটিতে সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও গল্পটি প্রকৃতপক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। কেশরলালের ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম একটি সনাতন, অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাব বা কেবল একটি অভ্যাসের সংস্কার মাত্র—এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রশ্নটি লেখক কেবল উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'অধ্যাপক' গল্পটির অনেকগু [illegible]

দিক আছে—একটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দিক। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটি প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ় প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবিপ্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণপটুতার আশ্চর্য্যরূপ মিলন ও একীকরণ সাধিত হইয়াছে। 'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত বন্য মৃণ্ময়ীর অভাবনীয় আমূল পরিবর্ত্তন, যে অদৃশ্য প্রভাবে তাহার বালসুলভ চপলতা নিমেষমধ্যে রমণীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ-সজল গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহার চিত্রটি যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অনবদ্য। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের একটি অনুপম সংযত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা একটি স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও একটু পরুষ, বুদ্ধি-কঠোর স্পর্শ বা পুরুষোচিত উগ্র ঝাঁঝাল সমালোচনার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। কি পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে সর্ব্বত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়; বিশেষতঃ অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যবোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—"অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই [illegible]দ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন [illegible]ীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি

আপনি অনুভব করিতে পারি।" এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি— বোধ হয় চক্ষুহীন ভিন্ন ইহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুমান্ প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ যন্ত্রবদ্ধ জীবন-যাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। আপিস ও গৃহস্থালীর লৌহনিগড়বদ্ধ, চিরাভ্যস্ত জীবনের নিতান্ত বাঁধা ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দ্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্ব্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হরসুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক কর্ত্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয় ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকালমৃত্যুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙালী পরিবারের অতিসাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতিসাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়।

প্রেমমূলক অন্যান্য গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনার সময় নাই। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্ত্তিনী'র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, নিখুঁত সম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। কিন্তু এগুলিতেও, কোথাও বা একটু চরিত্র-সৃষ্টি,

কোথাও বা একটু অপরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা, কোথাও বা মানবজীবন সম্বন্ধে একটু গভীর মন্তব্য, তাহাদের উপর একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজোপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এই চরিত্রটি কেবল সাধারণ বর্ণনার দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে, কার্য্যে বা ব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয় নাই। ইহার মধ্যে দুইটি প্রকৃতি-বর্ণনা, মনের সহিত বহিঃ-প্রকৃতির নিগূঢ় ভাবগত ঐক্যের দুইটি মুহূর্ত্ত সমস্ত গল্পটিকে কল্পনালোকের উচ্চ প্রদেশে লইয়া গিয়াছে। একটির উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীব ও আপনার জানালায় বসিয়া রহিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্ত রব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লীধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার সমস্ত মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

'মালাদান' গল্পটিতে হরিণশিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক বোধহীন

বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জাকুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে লেখক বেদনারহস্যমণ্ডিত মানবহৃদয়ের সহিত স্বতঃউৎসারিত আনন্দ-নির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন! "যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোন প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবমধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?" 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে প্রেমের আর এক নূতন দিক দেখান হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাকুল আত্ম-প্রতারণা স্খলিতপ্রায়, অপসরণোন্মুখ প্রেমকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা সমস্ত গল্পটিকে একটি ব্যথিত করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ও তাহার মধ্যে একটা রোগতপ্ত মনের বিকার আশ্চর্য্যভাবে সঞ্চারিত করিয়াছে।

(২) এইবার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা করিব। আমাদের এই অত্যন্ত যন্ত্রবদ্ধ সামাজিক জীবনে,—যেখানে সকলেরই একটা বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে ও ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ,—সেখানে মাঝে মাঝে একটি বিচিত্র, অপ্রত্যাশিত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া রোমান্সের সূত্রপাত করে। পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্য্যয়, একটা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের সৃজন হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজনির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট গল্পে পূর্ণমাত্রায় এই সঙ্কীর্ণ অবসরের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অত্যন্ত

পাকা প্রস্তর দুর্গের মধ্যে যে দুই-একটা গোপন অলক্ষিত রন্ধ্রপথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যের প্রবেশ পথ রচনা করিয়াছেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটিতে নির্জ্জন পল্লীজীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারাপাতের মধ্যে প্রবাসী পোষ্টমাষ্টারের সহিত অনাথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহসম্পর্ক সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পারিবারিক জীবনের চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই তাহার এত করুণ, শঙ্কিত আবেদন। 'ব্যবধান' গল্পটিতে বনমালী হিমাশুমালীর মধ্যে ভালবাসাটি পারিবারিক বিরোধ ও প্রতিকূলতার মধ্যে একটি শীর্ণ কুণ্ঠিত বেদনার মত নিজেকে কোন মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'তে এই স্নেহবন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্ত্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। 'দান প্রতিদানে' শশিভূষণ রাধামুকুন্দের নিঃসম্পর্ক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে একটা নীরব অনুযোগ ও রুদ্ধ অভিমানের স্পর্শ একটি ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সহোদর ভ্রাতার সহজ সম্পর্কপ্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'মাষ্টার-মশায়ে' মাষ্টার হরলাল ও ছাত্র বেণুগোপালের মধ্যে এরূপ একটা নিবিড় কুণ্ঠা-বেদনাজড়িত বাধাপ্রতিহত স্নেহপাশই হতভাগ্য হরলালের জীবনটিকে ট্র্যাজেডির দুশ্ছেদ্য জটিল জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণের সহিত গিরিবালার সম্পর্কটিও এই মধুর অনিশ্চয়ের ম্লানছায়ামণ্ডিত; গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি শেষের গানটিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর গল্পটি শশিভূষণের জীবনকাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।

সময় সময় একই পরিবারভক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই স্নেহসম্পর্ক

ঠিক সহজ, স্বাভাবিক বিকাশের দিকে না গিয়া একটা বক্র, বঙ্কিম গতি বা অস্বাভাবিক তীব্রতা লাভ করিয়া থাকে। 'পণরক্ষা'য় বংশীবদন ও রসিকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঠিক ভ্রাতৃপ্রেম নহে—তাহার মধ্যে মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস ও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ 'রাসমণির ছেলে'র মধ্যেও মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ পরস্পর রূপান্তরিত হইয়া একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। পুত্রের প্রতি ভবানীচরণের স্নেহ মাতৃস্নেহের মতই অজস্র প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে; রাসমণির ভালবাসার মধ্যে পিতৃ-শাসনের দৃঢ়তা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'কর্ম্মফল' গল্পটিতে একদিকে পিতার কঠোর শাসন ও অন্যদিকে মাসীর অস্বাভাবিক ও অচিরস্থায়ী স্নেহাতিশয্য সতীশের জীবনের সমস্ত দুর্দ্দৈব সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই গল্পটি ঠিক বাস্তব অবস্থার অনু-গামী বলিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য ততটা ফুটিয়া উঠে নাই; আর ইহার শেষ ফল ও চরম পরিণতিও ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী।

এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'দিদি'ই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। ছোট ভাইটিকে লইয়া শশিমুখীর স্বামীর সহিত যে 'নীরব দ্বন্দ্বের গোপন ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে,' তাহা ঘটনাচক্রে একেবারে বিরোধের চরম সীমায় গিয়া পৌছিয়া অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। আবার এই বিরোধ তাহার নবজাগ্রত প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের মতই আসিয়া পড়িয়াছে ও তাহার শান্ত নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে একটি দারুণ দুর্ব্বিষহতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের সমাজ ও পরিবারের আর একটা দিক আছে যাহা ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যসৃষ্টির কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে—তাহা সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ। 'হালদার গোষ্ঠী'

গল্পটিতে এই ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। বনোয়ারী লালের বৃহৎ ব্যক্তিত্ব তাহার পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া অত্যন্ত অসঙ্গতরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাহার সহিত তাহার পরিবারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রেমের নিগূঢ় দাবীই বনোয়ারীলালের বিদ্রোহাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। সে জমিদার-বংশের বড ছেলে বলিয়া নহে, তাহার পুরুষকারের স্বাধীন অধিকারের দ্বারাই নিজ স্ত্রী কিরণ-লেখার চিত্ত জয় করিয়া লইতে চাহে —তাহার বাড়ীর অতি নিয়মিত ব্যবস্থা তাহার প্রেমিক হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট খোলা ও উদার নহে বলিয়াই বংশপরম্পরাগত প্রথার সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত। আর তাহাব সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, কিরণও তাহার এই বিশাল প্রেমিক হৃদয়ের কোন সম্মান না রাখিয়া তাহার শত্রুদলে যোগ দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচারী পরিবারবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—প্রেমের স্নিগ্ধরশ্মি পরিবৃতা কিরণলেখা হালদার-গোষ্ঠীর বড়বৌ-এর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। এই গূঢ় বিরোধ ও অসঙ্গতির কাহিনীটি যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, বনোয়ারীর চরিত্র-বিশ্লেষণ ও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে।

এই বংশগৌরবের নির্দ্দোষ, নিরীহ দিকের চিত্র 'ঠাকুরদা' গল্পে দেওয়া হইয়াছে। নয়নজোড়ের বাবু-বংশের শেষ প্রতিনিধি ঠাকুর-দাদার বংশাভিমানে এমন একটি করুণ আত্মপ্রতারণা, মধুর সুষমা ও সহজ ভদ্রতা আছে যে, ইহা আমাদের বিরোধ-ভাবকে মাথা তুলিতে দেয় না। 'ঠাকুরদা' গল্পটি কোন সত্যান্বেষী বাস্তবতা-প্রবণ লেখকের হাতে পড়িলে Thackerayর "Book of Snobs"এর একতম অধ্যায়ে পরিণত হইতে পারিত—রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি ইহাকে একটি করুণ হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া সুন্দর ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের সমাজের প্রধান কলঙ্ক—বিবাহের অত্যাচার আলোচিত হইয়াছে, যথা, 'দেনা-পাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী' ইত্যাদি। এই বিষয়ের আলোচনা বাংলা উপন্যাসের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্যের খুব সাধারণ পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে লেখক কেবল অবিমিশ্র করুণ রসেরই উদ্রেক করিয়াছেন, কেবল 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রাঙ্কনে একটু বিশেষত্ব আছে। মোট কথা এই শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

(৩) তৃতীয় পর্য্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক রোমান্সসৃষ্টির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির বলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্য্যকলাপ বা চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অনায়াসে সামান্য দুই একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিও প্রকৃতির সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার আভাষ-ইঙ্গিত-আহ্বানবিজড়িত রহস্যময় আকাশ-বাতাসের মধ্যে এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি গল্প একেবারে আদ্যোপান্ত প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয়ে

আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'অতিথি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষমতার চূড়ান্ত উদাহরণ। 'তারাপদ' লেখকের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সঞ্চরণশীল, প্রবহমান, চিরচঞ্চল পৃথিবীর প্রাণের সহিত তাহার এক আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা আছে। মানুষের এই অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নাই বলিয়াই তাহার ভালবাসার মধ্যে এমন একটা প্রবল মোহ ও সঙ্কীর্ণ আসক্তি দেখা যায়। তারাপদর স্নেহ বন্ধনের মধ্যে ধরিত্রীমাতার সেই উদার অনাসক্ত ভাব, সেই শিথিলতা ও পক্ষপাতহীনতা আছে। মানুষ নিজের জন্য যে ছোট ছোট ঘর রচনা করে, তাহার চারিদিকের স্নেহের বেষ্টনের মধ্যে এক গাঢ়তর মোহাবেশ আছে—প্রকৃতির স্নেহে কোনো মোহাবেশ, কোনো ব্যাকুল বাষ্পসজলতা নাই। তারাপদ প্রকৃতির এই উদার অনাসক্তি, এই মোহমুক্ত চিরচঞ্চলতার মনুষ্য প্রতিরূপ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার লুসি, রাথ ও অন্যান্য গ্রাম্য নরনারীর চিত্রে প্রকৃতির কল্যাণী মূর্ত্তির একটা বিশেষ দিক্‌কে আকার দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই মূর্ত্তিকল্পনা মূলতঃ তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক দার্শনিক মতবাদের কবিত্বময় রূপান্তর। যাহার সেই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস নাই, সে এই চিত্রগুলির বৈধতায় ও নৈতিক উৎকর্ষবিষয়ে সন্দিহান হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তারাপদর চরিত্রে প্রকৃতির সহিত যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর নিভর করে না, সর্ব্বসাধারণের স্বাধীন অনুভূতিই তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারে।

'তারাপদ'র সহিত 'আপদ' গল্পের নীলকণ্ঠের কতকটা অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে এবং এই দুইটি চরিত্রের তুলনা করিলে তারাপদ-চরিত্রের গূঢ় মাধুর্য্য ও পবিত্রতা বিশেষরূপ বুঝা যাইবে। তারাপদ তাহার অবারিত সহজ প্রাণের বলেই মতিবাবুদের পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছে; নীলকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া দৈববশে কিরণদের

বাগানবাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছে। একের অবাধ, অসঙ্কোচ আতিথ্যগ্রহণ; অপরের কুণ্ঠিত অনুগৃহীতের ভাব। তারপর পরস্পরের চরিত্রানুরূপ উভয়ের মনোরঞ্জনের উপায় বিভিন্ন—তারাপদ সাঁতার দিয়া, কাজকর্ম্মে সাহায্য করিয়া, নিজ সহজ শক্তির অবলীলাক্রম বিকাশে ও দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিয়া কর্ত্তা গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝিমাল্লাদের পর্য্যন্ত মনোহরণ করিয়াছে। নীলকণ্ঠ যাত্রার দলের গানের দ্বারা, কতকটা অভিনয়ের কৃত্রিম উপায়ে কেবল কিরণবালার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তাহার প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের জন্য বাড়ীর অপর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছে। তারপর তারাপদর উদার হৃদয়ে ঈর্ষ্যা, অভিমান প্রভৃতির লেশমাত্র নাই—প্রকৃতিমাতার স্তন্যপানে লালিত, তাহার অন্তঃকরণে কোন সঙ্কীর্ণতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকণ্ঠ কিরণের স্নেহের ভাগ লইয়া সতীশের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছে ও চৌর্য্যরূপ হেয় কর্ম্মে পর্য্যন্ত নামিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকেও কতকটা ঔদার্য্য ও স্নেহশীলতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; তাহার ঈর্ষ্যাপরায়ণতা তাহার বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র, ইহাতে নীচতার কোন স্পর্শ নাই। আবার দুইজনের মধ্যে আবির্ভাবের যেমন, তেমনই তিরোধানেরও একটা বিভিন্নতা আছে—তারাপদ তাহার সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহাকে বশীকরণের সমস্ত আয়োজন পায়ে ঠেলিয়া দিয়া, উদাস অনাসক্ত প্রকৃতিমাতার বক্ষে লুকাইয়াছে; নীলকণ্ঠ সকলের বিরাগ লইয়া ও একের ক্ষুব্ধ স্নেহমাত্র সম্বল করিয়া নিতান্ত অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারপর যে-প্রকৃতির সহিত সে একাত্ম, নীলকণ্ঠ তাহার প্রসাদের কণামাত্র পাইয়াছে।

নীলকণ্ঠের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব স্নেহের মায়াদণ্ড-স্পর্শে তাহার সুপ্ত পুরুষোচিত আত্মসম্মানবোধের উদ্বোধন। লেখক অতি

নিপুণতার সহিত তাহার এই গূঢ় পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ীর ন্যায় নীলকণ্ঠও অতি অল্পকালের মধ্যে ভালবাসার স্পর্শে আত্মবিস্মৃত বাল্যকাল হইতে পরিণত যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভালবাসার প্রভাবে এই মানসিক গূঢ় পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে মৌলিকতার পরিচয় দেয় এবং ইহা আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত বেশ সহজভাবেই মিলিয়াছে।

(৪) এইবার চতুর্থ পর্য্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা করিব। সাধারণ বাঙালী জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংযোগসাধন এক দিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিকে বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীবভাবে বর্ত্তমান আছে, যাহাদের অতিপ্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-বিরল, যে ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ের দ্বারা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ; রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে। 'সম্পত্তিসমর্পণ', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কলাকুশলতার পরিচয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের যে প্রতিবন্ধক তাহা তিনি আশ্চর্য্য কল্পনা-সমৃদ্ধির সহায়তায় অতিক্রম করিয়াছেন। 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মণি-হারা' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত, বাস্তব জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়-সাধনের দুরূহতা বিষয়ের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরেজ কবি কোলরিজ এ বিষয়ে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। কিন্তু তাঁহাকেও অতিপ্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। তাঁহার Ancient Mariner ও Christabel উভয় কবিতাতেই

তাঁহাকে নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। আবার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিত সুদূরের রহস্য মাখানো। 'Ancient Mariner' এ মেরুপ্রদেশের নিঃসঙ্গ ধবল তুষারস্তূপ, রৌদ্রদগ্ধ নিবাত ,নিষ্কম্প অনন্ত মহাসাগরের নিবিড় নীরবতা, চঞ্চলশিখা, বিচিত্রাভ বাড়বানলের মধ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের আসন রচনা করিতে হইয়াছে, পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়াতরী ডুবাইতে হইয়াছে। 'Christabel'-এও নিশীথ স্তব্ধ অরণ্যানী ও মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত দুর্গাভ্যন্তরেই প্রেতলোককে আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গণের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া একপদও অগ্রসর হন নাই। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞান-সম্মত যে ব্যাখ্যা—"the spot in the brain that will show itself out" মস্তিষ্কবিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি—তাহা তিনি তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

'নিশীথে' গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত, প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অপরাধ হেতু গুরুভারগ্রস্ত স্বামীর সাময়িক মনোবিকার হইতে উদ্ভূত। মৃত্যুশয্যাশায়িনী প্রথমা স্ত্রীর ত্রস্ত ব্যাকুল প্রশ্ন 'ওকে, ওকে, ওকে গো' অনুতপ্ত স্বামীর মস্তিষ্কে এমন গভীর, অনপনেয় রেখাতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই কয়েকটি সামান্য আর্ত্তবাণীর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস আপন গভীর, অতলস্পর্শ সুরে উহার শঙ্কিত শিহরণটুকু, উহার ব্যথিত

রেশটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে। আর এই মনোবিকারটুকু ঘটাইতে লেখকের বিশেষ আয়োজন বাহুল্য করিতে হয় নাই—একটা উপনগরস্থ বাগানবাড়ীর ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত বকুলবেদী, বা পদ্মার তটে কাশবন-পরিপ্লুত নির্জ্জন বালুতটের মধ্যেই এই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ সমস্ত গল্পটির মধ্যে সম্ভবের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে এমন একটি রেখাও নাই। এই অতিপ্রাকৃতের অসীম সাঙ্কেতিকতা, আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত কলসীর মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যদেহের ন্যায়, সঙ্কীর্ণপরিধি বাঙালী জীবনের মধ্যে সহজেই স্থানলাভ করিয়াছে।

'মণিহারা' ও অনেকটা 'নিশীথের' ন্যায় সদ্য পত্নীবিয়োগ-বিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই তুষার-শীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই। বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্ত্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য্য সুসঙ্গতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই realistic setting বা বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অপরূপতা আরও রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল, সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়ের মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে। এই সন্দেহ দোলায় দোলায়মান পাঠকের মন বলিতে থাকে, "Did I dream or wake?" ক্ষুধিত পাষাণের অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বাদশাহী যুগের

সমস্ত ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তর-সঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস তাহাদের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে। বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম তাহার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ ও রহস্যময় সঙ্কেত ছড়াইয়া রাখিয়াছে—কবি যেন এই পঙ্কিল উচ্ছ্বসিত কামনা-প্রবাহের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত "বস্তু-অংশ বর্জ্জন করিয়া রস-অংশ ছাঁকিয়া লইয়াছেন।" ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, সাঙ্কেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্র-নাথের ক্ষুধিত পাষাণের অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতপ্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে, ট্রেণ-প্রতীক্ষার অবসরে। এখানেও 'realistic setting'টি লেখককে গল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সুযোগ দিয়াছে,—তাঁহাকে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিবার অসুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। এই তিনটি অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—পৃথিবীর যে-কোন ঔপন্যাসিক এই শক্তিতে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প আছে যাহাতে অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশে বস্তুতঃ প্রকৃত বিষয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে কথাগুলি দেওয়া হইতেছে মৃতা রমণীর মুখে, কিন্তু মৃতের এই আত্মজীবন-কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতের তুষারশীতল স্পর্শটি আনিবার কোন চেষ্টা নাই। যে প্রগল্‌ভা রূপযৌবনমোহাবিষ্টা রমণী গল্পটি বলিতেছে, সে দুই চারিটি মর্ত্তালোকসুলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া প্রেতলোকের বিশেষত্ব বিশেষ কিছু অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতে

একটি অসাধারণ মনোভাবের বিশ্লেষণ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে লেখক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। জীবিতা শ্মশানপ্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেকে সত্য সত্যই মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এবং লেখক তাহার চিন্তায় ও ব্যবহারে এক প্রকার সুদূর নির্লিপ্ততার ভাব মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সেরূপ অনুভূতির গভীরতা নাই। সুতরাং গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটি কল্পনারসে ভরপূর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার প্রধান যুগটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ে তিনি যে গল্পসাহিত্যের নূতন অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাতন গল্পগুলির এইখানে ব্যবচ্ছেদরেখা টানা যাইতে পারে। আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্ব্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। এই প্রভেদ প্রথমতঃ বিষয় নির্ব্বাচনেই দেখা যায়। পূর্ব্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবনযাত্রার গভীর মর্ম্মস্থল হইতে উদ্ভূত। এক একটি গল্প যেন তাহার হৃদ-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কেবল মাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং আমাদের পুরাতন সমাজের চারিদিকে যে নবীন উন্মাদনা ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, যে অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ পুরাতন উপকূলের আশেপাশে মুখর হইতেছে, তাহারই বিদ্রোহ-বেগটি জীবনের ছন্দে তালে গাঁথিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এই নূতন

যুগের সমস্যাগুলি পুরাতনদের ন্যায় এত গভীর ও ব্যাপক নহে, ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই ইহাদের প্রভাব ও প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ। ইহারা প্রায়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য, তীক্ষ্ণতর্ক-কণ্টকিত; বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া এখনও হৃদয়ভাবের গভীরতর স্তরে অবতরণ করে নাই। ইহাদের প্রভাব হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, চোখা চোখা বুলি, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, অশ্রুর গভীর প্রবাহ উৎসারিত হয় না। তথাপি ইহাদের নূতনত্ব বিশেষ উপভোগ্য, আমাদের জীবনে যে তিল তিল করিয়া নবমেঘের সঞ্চার হইতেছে তাহার বিদ্যুচ্ছটার একটা ভীষণ রমণীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্ব্বসূচনকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগুলির সমসাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার সমস্যাটি যে আধুনিক তাহা নহে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ একটা নূতন ব্যাপার। প্রেম বস্তুটিকে আমরা এতদিন রোমান্সের বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলাম, ইহার বিচ্ছেদব্যথা, ইহার গোপন মাধুর্য্য, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ, ইহার মুক্তি ও বিস্তারের দিকেই আমাদের লক্ষ্য আবদ্ধ ছিল। যাহাকে বাহিরের জগতে বড় করিয়া দেখিয়াছি, নিজ গৃহকোণে, পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে, বিধিনিষেধের অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাহার যে কুৎসিত, লজ্জাকর অভিব্যক্তি তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় বিষয়ের বৈধতা লইয়াও বাদ-

প্রতিবাদের অন্ত নাই। মোটের উপর এবিষয়ে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কলাসৌন্দর্য্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজ-বিগর্হিত বিকাশও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিত আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছসলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নষ্টনীড়ে' পূর্ব্বলিখিত সর্ত্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম একটা দুর্দ্দমনীয়, অপ্রতিরোধনীয় হৃদয়াবেগ মাত্র, ইহা চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া পাপের পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করে নাই। তারপর লেখক কি সুকৌশলে, পুঞ্জীভূত কারণ দেখাইয়া এই প্রেমের উদ্ভবটিকে সম্ভব করিয়াছেন—ভূপতির ঔদাসীন্য, অমল ও চারুর পরস্পর স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ, তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চার নিবিড় নেশা ও নিভৃত গোপনতা, মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যাতে তাহার গূঢ় পরিণতি, সর্ব্বোপরি অমলের বিবাহ-সংবাদে তাহার অনিবার্য্য, অনাবৃত প্রকাশ, এই সমস্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলিই লেখক যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া কার্য্যকারণশৃঙ্খলাটি অতি নিপুণভাবে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। এই কাহিনীর অন্তরালস্থ গভীর ভাবগুলি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকট করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা নিতান্ত অকারণে প্রেমের উদ্ভব ঘটাইয়া বাস্তবতার মূল ভিত্তির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেন। যেখানে সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেখানে এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের যথেষ্ট ও সঙ্গত কারণ না দেখাইলে, আমাদের বিচারবুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে চাহে না।

'স্ত্রীর পত্র' বর্ত্তমানের নারীর অধিকারঘটিত আন্দোলনের প্রথম

উৎপত্তিস্থল। লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর যে বিদ্রোহবাণী আজ প্রতি মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। অবশ্য এখানে গল্পের উপযুক্ত ঘাত-প্রতিঘাত নাই, কেননা কথাগুলি সমস্তই একতরফা। এইরূপ তীব্র শ্লেষাত্মক একতরফা কথার propagandism হিসাবে মূল্য আছে, কিন্তু আর্টের অপক্ষপাত ও সমদর্শিতা তাহাতে নাই। বিশেষতঃ মৃণালের ক্রোধের ঝাঁজটা একটু অতিরিক্ত তীব্র বলিয়া মনে হয়, কেননা যে হতভাগ্য পুরুষ এই বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে, তাহার নিজের ততটা অপরাধ নাই, সে সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি স্বরূপেই এই অগ্নিবাণ হজম করিতে বাধ্য হইয়াছে।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটাও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্ম্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ, কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা পুরুষের স্ত্রীজাতির উপর কাপুরুষোচিত আস্ফালন; সমাজ-চ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মন্তব্যগুলি ভাবগভীরতার অভাব পূরণ করে—যেখানে তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করেন, সেখানেও তাঁহার বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতায় চমৎকৃত করিয়া থাকেন।

'পয়লা নম্বর' প্রধানতঃ অদ্বৈতচরণের individuality বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি—তাঁহার নিশ্চিন্ত ও একাগ্র জ্ঞানানুশীলনের পশ্চাতে যে একটি ক্ষুব্ধ নারীহৃদয় নীরব বিদ্রোহে প্রধূমিত হইতেছিল, তিনি সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ ও উদাসীন। অনিলা বরাবরই অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে—তাহার দিকের কথা ভাল করিয়া বোঝান হয় নাই। অদ্বৈতচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি সিতাংশু মৌলির,

সে নিজ সহজ ক্ষমতাবলে পরকে নিজের কাছে টানিতে পারে, ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যই তাহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। এই সহজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের বলে সে অনিলারও চিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনিলার নিকট কোন সাড়া পায় নাই, কিন্তু তাহার নিশ্চল শান্তিকে বিচলিত করিয়া তাহাকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এই গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ-চেষ্টা থাকিলেও, মোটের উপর ইহা দুইটি বিপরীত-প্রকৃতি ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ।

'নামঞ্জুর' গল্পে 'ঘরেবাইরে'র ন্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদের ফাঁকা দিকটা দেখান হইয়াছে; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার মধ্যে যে খ্যাতির লোভ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তাহাদিগকে সাংসারিক ছোটথাট স্নেহযত্নমণ্ডিত কাজের প্রতি বিমনা করিয়া তাহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও মাধুর্য্যের হানি করিয়া থাকে। মিটিং করিয়া ভাঁইফোঁটার অনুষ্ঠান ও গৃহে রুগ্ন ভ্রাতার সেবাতে অবহেলা—এই দুয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট ফাঁকির ব্যবধান আছে তাহা আমাদের সাধারণ আন্দোলনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

এই শেষের কয়েকটী গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক লেখকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয়জীবনে যে সমস্ত সমস্যার নবীন উদ্ভব হইতেছে, তাহারা এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ের গভীর স্তরে কাটিয়া বসিবার সময় পায় নাই, এখনও অন্তরের মাধুর্য্যরসে অভিষিক্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমান আলোচনায় হৃদয় হইতে বুদ্ধিবৃত্তিরই প্রাধান্য। কালে ইহারাই আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহাদিগকে ঘেরিয়াই আমাদের গভীরতম আশাআকাঙ্ক্ষাগুলি বিকশিত হইয়া উঠিবে, ইহারাই মানুষের হৃদয়গত যোগসূত্র হইয়া নূতন সামাজিক ও

পারিবারিক প্রতিবেশ রচনা করিবে। সুতরাং ইহারাই যে কালে ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের শেষ শস্যগুচ্ছ ঘরে তুলিয়া তিনি ভবিষ্যতের ক্রমসঞ্চীয়মান ভাবসম্পদের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষনয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

ছিন্নপত্র

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

টেনিসন-জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।··· কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্ম্মে, উভয়েই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহার জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"

"ছিন্নপত্র" পাঠান্তে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবন কাব্য, এবং তিনি সেই ক্ষণজন্মা ব্যক্তি যিনি কাব্যে এবং জীবনের সকল কর্ম্মে নিজের প্রতিভা বিকাশ করেচেন। তাই এই পত্রগুলির স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বিত তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর কাব্যকে মিলিয়ে দেখলে যেন তার অর্থের বিস্তৃতি এবং ভাবের নিবিড়তা নূতন ক'রে উপলব্ধি করি।

একথা শোনা যায় যে, জীবনকে কাব্য ক'রে তুলতে গেলে জীবনে কাব্যের উপকরণ থাকা চাই। দৈন্যপীড়িত, সংসারভারজর্জ্জরিত কবির অসুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে কাব্যের উপকরণ কোথায়? "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" প্রাত্যহিক জীবনকে যেখানে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, জীবনে ও কাব্যে সঙ্গতি আশা করা সেখানে অন্যায়। এ কথার মধ্যে হয়ত কিছু সত্য আছে, কিন্তু অত্যুক্তিও

অনেকটা আছে। প্রতিদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণা, চারিদিকের প্রীতিহীন জনতার ঔদাসীন্য যে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ও আচরণে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে বাধা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধা আছে, এই কথাটাই হল সবার বড়? বাধা দূরের কথা কি মনেও আসবে না? আর আবেষ্টন অনুকূল হলেই বা ক'জন, তার সুযোগ নিই, কেই-বা আমরা সাড়া দিই আমাদের চারিপাশের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডাকে?

এই চিঠিগুলি জীবনে ও কাব্যে এক পরমাশ্চর্য্য সংমিশ্রণের কাহিনী। যে-জীবনের আভাস আমরা এতে পাই সে-জীবনে প্রতিদিনের তুচ্ছতা, ছোট কাজ ছোট কথা, স্বার্থজড়িত শত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার স্থান নেই। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব, আকস্মিক ঘটনার দাসত্ব, "পীড়িত জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক সকল অশান্তি"—কবি এ সকল থেকে মুক্তিলাভ করেচেন। যা চিরকালের এবং চিরনূতন কবির চিত্ত তাতেই মগ্ন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস প্রায় দশবৎসর ধ'রে আমরা কবির চিন্তা ও কর্ম্মের যে-ইতিহাস এ চিঠিগুলিতে পাই তাতে সর্ব্বত্রই দেখি বৃহতের প্রতি মহতের প্রতি তাঁর সহজ আকর্ষণ, এবং সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে তাঁর আনন্দপূর্ণ যোগ।

প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটী অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেজে চলেচে সকল কাজের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে একান্ত বিস্ময়কর এই কবির সৌন্দর্য্যবোধ। এর তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্য্য উপভোগের যে-আয়োজন ছিল সেটী মনোরম, কিন্তু তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাবও হয়ত কেউ দেখবেন। অথচ বছরের পর বছর প্রতিদিন দেখি কবির চিত্ত চারিদিকের রূপরসে কানায় কানায় পূর্ণ, এবং এত বড় দানের প্রাচুর্য্যে কৃতজ্ঞতায় বিনম্র।

বাংলা দেশের নির্জ্জন প্রান্তে নদীতীর, বালুচর, উন্মুক্ত আকাশ, দিক্‌রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ বা ধানের ক্ষেত, ছায়াঘন ছোট ছোট গ্রাম, পল্লীর অনাড়ম্বর জীবন, শান্তিপ্রিয় সরলবিশ্বাসী পরমসহিষ্ণু গ্রামবাসী—এরই মধ্যে একটি অপরূপ, বিমুগ্ধ কবিচিত্ত, চারিদিকের জল স্থল আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মানুষের মনের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে প্রতিদিন নূতন ক'রে বিস্মিত, শিশুর মত পুলকিত।

যারা নিজে অশান্ত, চঞ্চল, এবং বাইরেও প্রত্যক্ষগোচর গতি-চাঞ্চল্য সর্ব্বদাই চায়, তাদের কাছে কবির এ-জীবন একান্ত একঘেয়ে, এবং এই জীবনে তাঁর এত আনন্দ অবোধ্য। কারণ, এখানে দিনরাত্রি, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত এই সবই একমাত্র ঘটনা, পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু ধরণীর ও আকাশের রূপে, মেঘে রৌদ্রে ঋতুতে ঋতুতে। কিন্তু এ যে কত বড় ঘটনা, এ পরিবর্ত্তনে যে কি অশেষ বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা, কবি তা নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেচেন :—

"এই যে ছোট নদীর ধারে, শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য্য প্রতি দিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্তধূসর নির্জ্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্চে, জগৎসংসারে এ কি একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা। সূর্য্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব্বদিক থেকে কি এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্চে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্চে সেই বা কি আশ্চর্য্য লিখন—আর এই ক্ষীণ-পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কি বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা।'

আমাদের ব্যক্তিজীবনের পুঞ্জীভূত তুচ্ছতা, স্বার্থের শত ক্ষুদ্র দাবী, এই সুগম্ভীর সুবৃহৎ ঘটনাকে আমাদের চোখের আড়াল ক'রে দেয়। চিরাগত অভ্যাস বা তত্ত্বের ঠুলি প'রে আমরা বাইরের প্রকৃতি বা মানবজীবনকে দেখবার চেষ্টা করি—সবই বিকৃত, ঝাপসা ক'রে দেখি,

কিছুই নিতে পারি না, নিরানন্দ অন্ধকারে শুধু হাতড়ে বেড়াই। জীবনকে জটিল ক'রে, অসাড় মন নিয়ে আমরা দিনাতিপাত ক'রে চ'লে যাই, একবার সহজ চোখে চারিদিকে চেয়েও দেখিনা, বুঝিনা যে, কতবড় অমূল্য সম্পদ হেলায় হারাচ্চি।

"এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্যপরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলচে। কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর আমাদের ভিতর ভাল ক'রে তার সাড়াই পাওয়া যায না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা ক'রে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরো লক্ষ যোজন দূরে! রঙীন সকাল এবং রঙীন সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খ'সে প'ড়ে যাচ্চে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না।"

ঘুরে ফিরে বারে বারে চিঠির পর চিঠিতে এই কথা কবি কত নব নব রূপে বলেছেন। চারিদিকেই তাঁর একান্ত আত্মীয়ের ছড়াছড়ি, তাদের সবার সঙ্গে তাঁর শত সহস্র আনন্দ-বন্ধন—স্থলে জলে তিনি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে। লিখতে গেলেই তাদের কথা। কবে বর্ষণমুক্ত আকাশের সোনার আলো তাঁর রক্তের মধ্যে প্রবেশ করচে, কোন্‌দিন প্রকৃতি যেন স্নানের পর বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে প্রসন্নমুখে ভিজেচুল মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্চেন, কবে ঝড়ে বাগানের সমস্ত গাছপালা শিকলীবাঁধা জটায়ুপক্ষীর মত ডানা আছড়ে ঝটপট করচে, কবে সূর্য্যাস্তের সময় দিগন্তের শেষ প্রান্তে নীলেতে লালেতে মিশে মায়াময় আবছায়া হয়ে এল—এ সব খবর দেওয়াই চাই, কারণ এই সবই ত তাঁর "পার্সোনাল খবর," আর চিঠিতে ত পার্সোনাল খবরই দিতে হয়। বাস্তবিক এই চিঠিগুলিতে কবি তাঁর হৃদয়ের অন্তরতম কথাই বলেচেন, তাঁর চিত্তদুয়ার আমাদের

কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েচেন, তাঁর গভীরতম জীবনের, তাঁর নিবিড়তম উপলব্ধির প্রকাশ আমাদের সামনে ধরেচেন। এই ত তাঁর আসল জীবন; সেই আসল জীবনের, সমস্ত বহিরাবরণের অন্তরালবর্ত্তী গোপন মানুষটির অতি নিকট পরিচয় আমরা "ছিন্নপত্রে" পাই।) সুতরাং পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যে দুঃখ করেছিলেন যে, কবি এই পত্রগুলি ছাপবার সময় তাঁর দৈনিকজীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ বা তাঁর পরিচিত আত্মীয় বন্ধুর কথা ছেঁটে বাদ দিয়েচেন এবং তাতে ক'রে এই চিঠিতে ব্যক্তিগত রসটি আর নেই, সে দুঃখে এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করার কারণ দেখি না। নিজের গভীর অনুভূতি এবং উপলব্ধির এরূপ পরিশুদ্ধ, সমুজ্জল প্রকাশেও যদি ব্যক্তিগত রস না থাকে ত কিসে আছে জানিনা। তাঁর যথাযথ রূপটিই যে এখানে আমরা পাই তা তাঁর নিজের কথা দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে। একটি চিঠিতে তিনি লিখচেন, "নির্জ্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে, সুতরাং সেই সময় মানুষ বড় বেশি নিজেরই মত হয়।" এবং অন্যত্র, "জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্ব্বদা মৌন এবং সর্ব্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।" তাই শান্তিপ্রিয়, করুণাভরা, সৌন্দর্য্যপিপাসী, সর্ব্বভূতের কুটুম্ব যে আসল ব্যক্তি অন্যসময়ে বা অন্যস্থানে মৌন বা গুপ্ত থাকে আমরা তাঁরই সন্ধান এই চিঠিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আপন পরিচয় পূর্ণভাবেই দিয়েচেন, তাঁর মনের নিভৃতকথা কিছুই বলতে বাকি রাখেননি মনে হয়। তবু ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা কবিতাতেও এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে কখনও বলেন নি, তখন পর্য্যন্ত ত

নয়ই। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবন্ধনে থাকার সুযোগও কবি তাঁর জীবনে আর কোন সময়ে পেয়েচেন কিনা সন্দেহ। এই-যে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণে নৌকাবাসের জীবন, এতে একদিকে যেমন বাংলা দেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'তে লাগল, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একান্ত যোগ সাধিত হ'ল। নদী, গাছপালা, মাঠ, আকাশ, সকলকে তিনি স্বজন ব'লে জানলেন। পদ্মাকে তিনি "একটি স্বতন্ত্র মানুষের মত" কতরূপে দেখলেন, কখনো সে উন্মাদিনী দিশাহারা, ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে পড়েচে, নৃত্য করচে, ভাঙচে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেচে; কখনো সে স্বচ্ছ, কৃশকায়, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মত, সুন্দর ভঙ্গীতে চ'লে যাচ্চে, আর শাড়িটি গায়ের গতির সঙ্গে বেঁকে বেঁকে যাচ্চে। সন্ধ্যাতারা যেন তাঁর বহুকালের আপনার লোক সারাদিন কাজের পর যখন সায়াহ্নে নৌকায় নদী পার হন, তখন ওই সন্ধ্যাতারা দেখে মনে হয় যেন তাঁর এই নদীকূলের ঘরসংসারের সে-ই গৃহলক্ষ্মী, তাঁর বাড়ী ফেরার প্রতীক্ষায় সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে ব'সে আছে। ভোরের বেলায় চোখ মেলেই তাঁর বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী শুকতারাটিকে যখন দেখেন তখন মনে হয় যেন তাঁর নিদ্রিত মুখের উপর চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মত সারারাত্রি সে প্রফুল্ল স্নেহ বিকীরণ করেছিল। সন্ধ্যা নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর সুগভীর ভালবাসায় নত হয়ে পড়ে। যে প্রকাণ্ড পৃথিবী চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে তাকে তিনি এত ভালবাসেন যে, তার এই গাছপালা, নদী মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত সন্ধ্যা, সমস্তটা শুদ্ধ তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বলেন, "এই যে," সেও বলে "এই যে!" তার পর দুজনে পাশাপাশি ব'সে থাকেন। এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি তাঁর নাড়ীর

টান, দুজনে মুখোমুখি বসলেই তাঁদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। পৃথিবী তাঁর অনেক জন্মের ভালবাসার লোকের মতন।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

"প্রবাসী" নামক কবিতার এই পৃথিবীর সঙ্গে কবির গভীর এবং চিরদিনের চেনা শোনার ভাবটি তাঁর একটি চিঠিতে অপূর্ব্ব প্রকাশ লাভ করেচে :—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত, সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব! যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপচে।"

আর একটা চিঠিতে :—

"আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন, তখন আমি এই পৃথিবার নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নবনব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি.........আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' প'রে ঐ নদীতীরে শস্যক্ষেত্রে ব'সে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়চি।"

জগৎপ্রাণের সঙ্গে আপনচিত্তের চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধের এই সহজ অনায়াস উপলব্ধি আধুনিক জগতের আর কোনো কবি এরূপ অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ করেচেন ব'লে ত জানি না। শুধু মনে হয় ইংরাজ মহাকবি * Wordsworthএর মুখে কখনও কখনও এই সুরই যেন

* ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের "বিচিত্রায়" "শারদোৎসব" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন : "যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন (বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের) বাধা পায় নি সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন ক'রে বাজে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ "Three Years She Grew" নামক কবিতায় অপূর্ব্ব সুন্দর ক'রে বলেচেন। প্রকৃতির সঙ্গে অবাধমিলনে লুসির দেহমন কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে গ'ড়ে উঠবে তারি বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখেছেন :—"প্রকৃতির নির্ব্বাক ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তা'ই এই বালিকার মধ্যে নিঃশ্বসিত হবে।.........নিশীথরাত্রির তারাগুলি

শুনতে পাই, যেমন :—

I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man

এখানে Wordsworth-ও সূর্য্য নক্ষত্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানুষের জীবনকে একটি বৃহৎ প্রাণসূত্রে গ্রথিত দেখেচেন; সৌন্দর্য্যবিলাসী কবিদের মত প্রকৃতি তাঁর কাছে কতকগুলি রমণীয় দৃশ্যের সমাবেশ মাত্র নয়। অত সহজে, অত স্পষ্ট ক'রে না হলেও তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃতির মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত দেখেচেন। তিনিও জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক ও বর্ণের একতানের মধ্যে "the still sad music of humanity" শুনেচেন, যাকে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে বলেচেন "পৃথিবীর বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও বিষাদের······হা হা ধ্বনি।"

বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত মন জগতের আনন্দকে আপন চৈতন্যের ভিতর কি নিবিড় ভাবে অনুভব করে, সে অপূর্ব্ব ইতিহাসের পরমাশ্চর্য্য লিখন এই "ছিন্নপত্রে" আমরা পাই। এইটেই এ চিঠি সম্বন্ধে প্রধানকথা, এবং এই কথায় আবার ফিরে আসা যাবে; কিন্তু আপাতত দেখা যাক এই পত্রগুলিতে আর কি আছে।

হবে তার ভালবাসার ধন; আর, যে-সকল নিভৃত নিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হয়ে নেচে চলে সেইখানে কান পেতে থাকতে থাকতে কলধ্বনির মাধুর্য্যটি তার মুখশ্রীর উপর ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকবে।"

প্রথম শ্রেণীর কবি গদ্যলেখক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেচেন এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে ও পদ্যে, যেদিকে প্রতিভা পরিচালিত হয়েচে সেই দিকেই সর্ব্বোচ্চসাহিত্য সৃষ্টি করেচেন, অনেকসময় সাহিত্যের এইদুটি বাহনকেই জুড়িতে সমান তালে চালিয়েচেন, এমন লেখক জগতে কমই জন্মেচেন।

পাদ্রী টম্‌সন্ যাঁর কাছ থেকে শুনে তাঁর বইয়ে লিখেচেন যে "these Torn Letters contain some of the best prose that he ever wrote", তিনি বিচারশক্তিরই পরিচয় দিয়েচেন। ভাষার মধ্যে এত স্বচ্ছতা, এত নমনীয়তা, ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণ বৈচিত্র্য প্রকাশে এমন উপযোগিতা, সহজ অনাড়ম্বর সুষমার সঙ্গে এমন শক্তির সমন্বয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও কম দেখা যায়। ভাষার স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য অবশ্য বাইরের ছাঁচে-ঢালা জিনিষ নয়, বা তা অলঙ্কারের মত কেউ প'রে নিতে পারে না, ও হচ্ছে ভাবের স্বচ্ছতা এবং চিত্তের সৌকুমার্য্যেরই পরিচায়ক। তবু মনে হয় কবির চিত্তের সঙ্গে যে তাঁর প্রকাশের এই সহজ সামঞ্জস্য সংঘটিত হ'ল তার একটা কারণ এই যে, চিঠিতে তিনি দ্বিধামাত্র না ক'রে আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষা ব্যবহার করেচেন, কৃত্রিম সাধুভাষায় তাঁর নিবিড় অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ মনোভাব প্রকাশ করতে যাননি। এগুলি যদি চিঠি না হ'ত তাহ'লে হয়ত এসব কথা তিনি সাধুভাষাতেই লিখতেন,—সে আজ চল্লিশ বছরের কথা, যখন বঙ্গসাহিত্য ছিল সাধুভাষারই মুলুক,—তা' সে-ভাষার জোর থাক আর না-থাক। যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সাধুভাষার বহিষ্করণে ছিলেন অগ্রণী, চল্‌তি-ভাষার সেই বিজয়ী সেনাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ

চৌধুরী একবার বলেছিলেন যে, সাধুভাষা হচ্চে ধোপদুরস্ত, তার একটুও রং নেই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে তা স্বতঃই ফুলেও ওঠে এবং খড়্‌খড়ও করে। যেখানে বলার কিছু নেই, লেখার উদ্দেশ্য শুধু শূন্যকে ফাঁপিয়ে তোলা, সেখানে ঐ শব্দায়মান, স্বতঃস্ফীত আভরণকে অঙ্গীকার করাই অবশ্য বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু বলবার কথা যেখানে গভীর অথচ একান্ত সরল সেখানে আমাদের চল্‌তি ভাষা যে কতদূর উপযোগী এবং গুণীর হাতে তা কত সুরে বাজে তা এই চিঠিগুলি থেকে বুঝি।

একটা চিঠিতে পাই, "ঐ চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতি আমি হতাশপ্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি," কিন্তু রং ও তুলি দিয়ে ছবি আঁকুন আর নাই আঁকুন, কথায় রবীন্দ্রনাথ যে চিত্রাঙ্কণীপ্রতিভা দেখিয়েচেন তা বিস্ময়কর। যে-ক্ষমতা তাঁর গল্পে পরিস্ফুট, তার পরিচয় আমরা এই চিঠিতেও বড় কম পাই না। সাজাদপুরে কবি তাঁর খোলা জানলা থেকে নৌকাশ্রেণী, ওপারের গ্রাম, লোকালয়ের কর্ম্মপ্রবাহ দেখে লিখচেন, আর আমাদের সামনে একটি স্নিগ্ধ বিরল-রেখা চিত্র ফুটে উঠ্‌চে।

"পাড়াগাঁয়ের কর্ম্মস্রোত খুব বেশী তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চলেচে। খেয়া-নৌকো পারাপার করচে, পান্থরা ছাতা হাতে ক'রে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেচে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় ক'রে হাটে আস্‌চে, দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙ্গি উল্টে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করচে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারেধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটিকতক গরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর প'ড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর ব'সে যখন

বড় বেশি বিরক্ত করচে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্চে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ ঠুক্ ঠাক্ শব্দ, ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিনাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্চে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময়, স্বপ্নময়, করুণামাখা একটা বড় সঙ্গীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা।"

আর একটি ছবি দেখাই, এবার এক জনহীন, তৃণহীন বালুচরে :—

"দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করচে, তাতে না আছে গাছ না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের কাছে চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি না,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশী শূন্য মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই ; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভ'রে যেতে পারত সেখানে একটী কুশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নেই,—কেবল একটা উদাস, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চ'লে যাচ্চে, ওপারে ঘাট, বাঁধানৌকা, স্নানের লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর ধারের হাটের কলধ্বনি—দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা, কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটীর ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।"

পাতা উল্টে গেলেই এমন কত চিত্র চোখে পড়ে, দুচারটি আঁচড়ে আমাদের সম্মুখে সেগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। কবি দুচোখ ভ'রে চারিদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখে নিচ্চেন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করচেন, এবং সেই বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত যে মানবপ্রকৃতি তাতে কৌতূহলী হচ্চেন। ছায়া-সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলির পল্লবঘন আম্রকানন আর স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল যেমন দেখচেন, তেমনি দুঃখপীড়িত অসহায় গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাও তাঁকে আকৃষ্ট করচে। তাদের প্রতি সমবেদনায়

তাঁর মন আর্দ্র হয়ে উঠচে; এই নিতান্ত নিরুপায় নির্ভরপরায়ণ চাষীদের আপনার লোক মনে ক'রে তিনি তৃপ্তিলাভ করচেন। তাদের স্বচ্ছ সরলতাকে তিনি পুণ্যতোয়া গঙ্গার সঙ্গে তুলনা ক'রে বলচেন তাতে অবগাহন ক'রে সংসারের তাপ দূর হয়। তাঁর কোন অনুগত বৃদ্ধ প্রজার জরাগ্রস্ত রোগশীর্ণ দেহখানির মধ্যে তিনি একটি শুভ্র সরল কোমল মন দেখে নিজের চেয়ে তাকে কত বড় ব'লে মানচেন। অতিবর্ষণে ক্লিষ্ট চাষীরা যখন কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে আসচে তখন নিয়তির সে নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যথা এই শত শত অভাগার হয়ে তিনি নিজের অন্তরে অনুভব করচেন। (মানুষের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য ঘেরা গ্রামগুলি যেই তাঁর মনকে টানল, সহস্র রকমের গল্প তাঁর কল্পনায় তৈরী হতে লাগল, মানবজীবনের ঘটনা প্রকৃতির বেষ্টনের মধ্যে সরস সজীব হ'য়ে উঠল। তাঁর গল্পের কত বীজ দেখি এই পত্রগুলির মধ্যে ছড়ানো, কত বিশ্ববিখ্যাত গল্পের দেখি এইখানে আরম্ভ। একটা চিঠিতে লিখচেন তাঁর একটা "হ্যাপিথট্" এসেচে, তিনি বিশ্বের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দেবেন, তার চেয়ে বরং যা পারেন তাই করবেন, অর্থাৎ গল্প লিখবেন। তাই সেইদিনই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে তাঁর কল্পনারাজ্যে নামালেন। এমনি, আমাদের নিতান্ত পরিচিত আরো কয়েকটি চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা "ছিন্নপত্রে" পাই, যেমন পোষ্টমাষ্টার, মৃণ্ময়ী, ফটিক। অনেকগুলি চিঠি থেকেই, এবং বিশেষ ক'রে "পোষ্টমাষ্টার" রচনা সম্বন্ধীয় চিঠিখানা থেকে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটা প্রধান বিশেষত্ব আমরা ধরতে শিখি। দেখি যে তিনি যখন গল্প লেখেন তখন তিনি নিজের চতুর্দ্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে মনের মত একটা কিছু রচনা ক'রে চলেন, বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলো, বর্ণ, ধ্বনি

তাঁর কল্পলোকের মানুষের জীবনে মিশে যায়, সকল ঘটনার একটা আকাশ সৃজন করে। এর ফলে, প্রথমত, তাঁর গল্প অনেক সময় গীতি-কবিতার এই লক্ষণ পায় যে তা কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা mood দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং **বিশিষ্ট** হয়েও তাদের ব্যক্তিজীবনের-পাঁচিলে-ঘেরা কতকগুলি **বিচ্ছিন্ন** জীবমাত্র থাকে না, চারিদিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পনের সঙ্গে তারাও উদ্ভাসিত বা হিল্লোলিত হতে থাকে, এবং এক বিশাল বিশ্ব, যার মধ্যে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই বিধৃত, তারই অভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়। টম্‌সন্ এটা বুঝতে পেরেচেন তাই বলেচেন, "No poet that ever lived has shown such power of merging not only himself but his figures with the landscape."

এই চিঠিগুলি "সাধনার" যুগে লিখিত। কবির জীবনে সে এক আশ্চর্য্য সময়। শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে তিনি যে শক্তি ও আনন্দ সঞ্চয় করছিলেন তা তিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ রাখেননি, মুক্তহস্তে "বিশ্বজনারে" বিলিয়ে দিলেন। তাঁর এসময়কার সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, চিঠিতে তিনি নিজের প্রকাশ-ব্যাকুলতা যেন নিঃশেষ করতে পারছিলেন না, নিজের অন্ত যেন নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একটা চিঠিতে লিখচেন, "আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্ব্বত্রই আপনার জ্বলন্তশিখা প্রসারিত করতে চায়।" নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে চারিদিককার রূপ-রসগন্ধ একদিকে আহৃত হল, আর একদিকে আরম্ভ হল নূতন গড়বার পালা। চিঠিতে বা ডায়ারীতে হাল্কা ভাবে, সাবলীল অনায়াস প্রকাশ হল প্রথমে, তারপর মনের ভাবটি ধরা দিল ছন্দের বন্ধনে বা গানের

সুরে। "চৈতালী"র "মধ্যাহ্ন", "প্রভাত", "ধরাতল","ইচ্ছামতী নদী", "শুশ্রূষা", "আশিষ-গ্রহণ", "বিদায়", "পদ্মা"; "চিত্রা"র "পূর্ণিমা", "স্বর্গ হইতে বিদায়"—এইরূপ কত কবিতার গদ্যরূপ এই ছিন্নপত্রে পাই। মূল অনুভূতির এই বিচিত্র প্রকাশ এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখায় বড় আনন্দ আছে। নীরব কবির আলোচনা প্রসঙ্গে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন যে, কবির পরিচয় তার গঠনশক্তিতে। ভাষা বা অনুভাব থাকলেই হয়না, তা দিয়ে নূতন সৃষ্টি করার শক্তি থাকা চাই। ভাবুকে আর স্রষ্টায় প্রভেদ এইখানে। ভাবের বীজ যে কি ভাবে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে, সেই সৃষ্টিপ্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক। একটি ভাবের এই বিভিন্ন প্রকাশ মিলিয়ে দেখায় যেন সেই সৃজনপ্রণালীর একটা আভাস পাই, শিল্পীহৃদয়ের অসীম রহস্য যেন কিছুকিছু ভেদ করা যায়।

এই শান্তিময় জীবন, যেখানে দ্বন্দ্ববিরোধ নেই, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘর্ষ নেই, তা' দেখি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হতে চলেচে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের একটা চিঠিতে কবি লিখচেন, বিচিত্র কর্মের কাজ তিনি হাতে নিচ্চেন এবং অনুভব করচেন যে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার আবেগ এই সময়ে কবির চিত্তকে ব্যাকুল করতে থাকে, চিঠিতে তার সুর লেগেচে। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে লিখচেন, তাঁর "জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্চে।" এই আভাস পাচ্চেন যে, "সেই তাঁর সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু, তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা।" সেই নূতন সত্যের সন্ধানে পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন

জীবনের একটা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠেচে পরের চিঠিতে, "কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলচে,—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুনতে প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন ক'রে তুলচে ?"

জীবনে এক অধ্যায়ে এইখানে দাঁড়ি। নির্জ্জন, সুন্দর লোকান্তরালের গভীর শান্তি এবং পরিপূর্ণ আনন্দ ছেড়ে কবি কর্ম্মজীবনের সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর জীবনতরী প্রকৃতির নিভৃত মাধুর্য্যস্রোত বেয়ে মহামানবের সাগরে গিয়ে পড়ল।

পূর্ব্বেই বলেচি "ছিন্নপত্রে"র মূল সুর কি। উন্মুক্ত আকাশের আলো থেকে, নদীজলকল্লোল থেকে, দিগন্তপ্রসারিত শ্যামল ধরণী থেকে কবির পুলকিত চিত্ত যে অমৃত গ্রহণ করেচে, এ চিঠিতে আমরা তারই আস্বাদ পাই। সহজবোধ দিয়ে তিনি সুন্দরকে উপলব্ধি করেচেন, মনের দ্বার খুলে রেখে তিনি আলোকে গগনে তরুলতায় সেই সুন্দরের বাণী শুনেচেন। হাটের হট্টগোলে এই বোধশক্তি যখনই ক্ষীণ হয়েচে, নদীতীরে, ঊষার আলোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, তারাখচিত আকাশের তলে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেচেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দিত অন্তরে তিনি পৃথিবীকে চেয়ে দেখেচেন, আর সেই আনন্দের কথা বারে বারে ব'লেও মনে করেচেন বলা বুঝি কিছু হয়নি :

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই

দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সবল বাণী—
আমি নাহি জানি।
শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ঐ একা ছায়াবটে,
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হংস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীর তলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখী কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি!
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো. এই হাওয়া,

এইমত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেচে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

"ঘরে বাইরে"

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

'ঘরে-বাইরে' বইখানির চরিত্রক'টি সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। কবি রবীন্দ্রনাথের নয়।

মানবের মনস্তত্ত্ব ও তার নিগূঢ় অন্তঃপ্রকৃতির রসাভিব্যঞ্জনায় 'ঘরে-বাইরে'র সমান আসন গ্রহণ করতে পারে, বাংলা ভাষায় এমন কথা-সাহিত্য অল্পই আছে।

মানুষের ঐতিহ্যমুক্ত মনের বিভিন্নতর রূপাভিব্যক্তি—'ঘরে বাইরে' বইখানির মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই 'ঘরে বাইরে'রই মধ্যে ঐতিহ্যপাশে আবদ্ধ বুদ্ধি ও মন,—একটী নারী হৃদয়ের নিঃশব্দ সহজ বিকাশও আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে। রামায়ণের 'উর্ম্মিলা' 'কাদম্বরী'র 'পত্রলেখা' আমাদের অন্তরের মমতা-করুণ সহানুভূতি, নির্ম্মল শ্রদ্ধার স্নিগ্ধস্পর্শটুকু কখন যে এসে গ্রহণ করে, আমরা তা' জানতে পারিনা। আমাদের সারা চিত্ত যখন, সীতার দুঃখ-সুখ, কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার প্রিয়-বিচ্ছেদ-মিলনের আনন্দ-বিষাদে একান্ত নিমগ্ন অভিভূত হয়ে থাকে, তখন ঐ নিঃশব্দপ্রকৃতির নারীদের সুখদুঃখের কোনও অভিব্যক্তি বা সুস্পষ্টরূপ আমরা লক্ষ্য করা'র অবকাশ পাই না এবং প্রয়োজনও বোধ কবি না। কিন্তু তবুও, এরা কখন যে গোপন পদসঞ্চারে নীরবে এসে আমাদের অন্তরের অন্তরতম-স্থলটিতে নিঃশব্দব্যাথার সুবর্ণ-কাঠিটি ছুঁইয়ে চলে' যায়,—তা' কেউ টের পাইনে।

'ঘবে-বাইরে'র মধ্যে ঘরের নিভৃতকোণে, সবার আড়ালে নিঃশব্দে,

সহজ-বিকাশে বিকচ নারী-অন্তরটির পরিচয় আমি এই প্রবন্ধে সবার শেষে দেবার চেষ্টা করবো।

মানব-সভ্যতার সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—সমাজ। সভ্য মানুষ আজ তার স্ব-সৃষ্ট সমাজের সর্ব্বতোমুখী প্রভাবজালে নিজের অন্তর-বাহির, মন, বুদ্ধি, চিন্তা, সংস্কার, এমন কি তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে, পর্য্যন্ত এমন অচ্ছেদ্য পাশে জড়িয়ে ফেলেছে যে, আজ তার আর একটা নাম হ'য়েছে—সামাজিক জীব।

বর্ত্তমান সভ্যজগতের স্বাধীনভাবধারার উৎকর্ষ-প্রাপ্ত, অনুসন্ধিৎসু মানবমনের ঐতিহ্য-বিরহিত চিন্তার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক্ 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ ও নিখিলেশে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

মানবের চিত্তের অন্তর্গূঢ়লোকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়'র,—প্রেম ও মোহের যে চিরন্তন দ্বৈরথ সমর চলেছে,—তারই প্রতীক—শ্রীমতী বিমলা।

বিশ্বের ক্রম-বিবর্ত্তনে মানুষ তার আবিষ্কারশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, গ্রহণশক্তি, মন, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা,—সব কিছুরই উৎকর্ষসাধনে দ্রুত উন্নত হ'য়ে চলেছে। বর্ত্তমান যুগের মানুষের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা জাগ্রত হ'য়েছে—সকল তত্ত্বের মূল তথ্যানুসন্ধান।

নিজের জীবনে খুব বড় পরিধি দান করে', সে, যে সকল বস্তু গ্রহণ ক'রতে চায়, তা'র স্বরূপের যথার্থতা জানবার জন্য—জীবনে বৃহত্তর দুঃখ ও চরম ক্ষতি মূল্য ধরে' দিতে প্রস্তুত হয়েছে। রূপের স্বরূপ অনুসন্ধানে তাই সে বাস্তবের ধূলা-মাটি ছাড়িয়ে, বাস্তবাতীত অসীমে তার চিন্তা ও কল্পনার পাখা মেলে দিয়েছে। মানস-লোকে অন্তঃপ্রকৃতির অতল তলে নেমে গিয়ে, জাগ্রত-চৈতন্য (Conscious) ও মগ্ন-চৈতন্যের (subconscious) সদর অন্দরে'র রুদ্ধ গোপন কুঠরিগুলিও খানা-তল্লাস করতে পশ্চাৎপদ হয়নি।

'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ,—মানুষের এই শুভ্র নির্ম্মুক্ত সত্যস্পৃহা বা সত্যসাধনার উজ্জ্বল প্রতীক।

নিখিলেশ ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ প্রেম-তীর্থের তীর্থ-যাত্রী। স্থূল কামনা-রূপ সন্দীপ তা'র বাঁশীর সুর বুঝতে পারে না। স্থূল-ভোগের চেয়ে, সূক্ষ্ম-ভোগের রসাস্বাদ কত যে গভীর-মধুর,—ফাঁকিভরা অসম্পূর্ণ পাওয়ার পেয়ে, অকৃত্রিম সত্যে সম্পূর্ণ না-পাওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা নিহিত, তা'র স্বাদ ও তত্ত্ব, অবিমিশ্র বাস্তববাদী সন্দীপের বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

নিখিলেশ ও বিমলা তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যবর্ত্তিতায়, অর্থাৎ সামাজিক বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়েই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিল। তা'রা প্রেমের মধ্যবর্ত্তিতায়, ও ব্যক্তিত্বের গৌরবানুকূল্যে মেশবার সুযোগ পায়নি। ভালো তা'রা বেসেছিল পরস্পরকে—ছায়াস্নিগ্ধ নিরাপদ গৃহনীড়ের নির্জ্জন কোণটিতে।

নিখিলেশ সেই স্বল্প-পরিসর গৃহকোণের অবগুণ্ঠিত প্রেমে পূর্ণ তৃপ্ত হ'তে পারেনি, তাই সে বিমলার ভালবাসা বাইরের উন্মুক্ত আলোর মধ্যে এনে, তার সত্য ও সুসম্পূর্ণ রূপটি দেখবার কঠিন নিষ্কামসাধনা করেছিল। সর্ব্ব আবরণমুক্ত সত্যের অনবদ্য রূপটিই ছিল নিখিলেশের আজীবনের সাধনার বিষয়। তার জন্য সে ঘরের ভিতরে, পরিবারের সংকীর্ণায়তন গণ্ডীর মধ্যে সমাজের হাতের টীকা-পরা স্বামী হ'য়ে তৃপ্ত হ'তে পারেনি। বাহিরে সবা'র মধ্যে দাঁড়িয়ে বিমলা'র অন্তর-লক্ষ্মীর নির্ব্বাচন-টীকা পরে,' তার স্বয়ম্বরের স্বামী হ'তে চেয়েছিল। নিখিলেশের প্রেমসাধনা—

—"নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার সাথে যেথায় বাহু পসারো,—
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

হিন্দুনারী স্বামী-রূপ আইডিয়াটিকেই ভালবাসে, 'ব্যক্তি' আইডিয়ার পিছনে আড়াল হ'য়ে থাকে। অগ্নি ও শালগ্রাম-শিলার সাক্ষ্য-সাহায্যে, ব্রাহ্মণপুরোহিত যেদিন ব্যক্তির অঙ্গে স্বামীত্ব-রূপ চাপরাশটি আজন্মের মত অচ্ছেদ্য-পাশে এঁটে দেন—সেদিন থেকে সেই চাপরাশটির গৌরবে তথাকথিত পত্নীর ভক্তি-প্রেম-প্রীতি-উর্ব্বর হৃদয়রাজ্যে অবাধে নির্ব্বিবাদে স্বামীর রাজত্ব করা চলে।

নিখিলেশের প্রেমাকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ-মূলক (analytic) সংশ্লেষণ-মূলক (synthetic) নয়। সে চেয়েছিল মামুলি স্বামীত্বের নিরেট আড়াল হ'তে বাইরে এসে, বিমলার কাছে তার নিছক-নিখিলেশত্বটুকুর দাম পেতে।

নির্ব্যক্তিক (impersonal) স্বামী হ'য়ে তা'র মত ব্যক্তি সার্থক হ'তে পারে না। তাই সে স্বামীত্বের সরকারী পরিচ্ছদটি (uniform) ঢাকা দিয়ে শাদা পোষাকে নিজের ব্যক্তিত্বটুকু মাত্র নিয়ে—বিমলার অন্তরলোকের স্বয়ম্বরসভায় সসম্ভ্রম শিরে দাঁড়িয়েছে। বিমলার জাগ্রত-চৈতন্যের প্রেম-পুষ্পদলে নিখিলেশের পূর্ণ-পরিতৃপ্তি ঘটেনি,—সে চেয়েছিল বিমলার মগ্ন-চৈতন্যের মানস-সরোবরে ফুটে-ওঠা প্রেমের দুষ্প্রাপ্য নীলপদ্ম, যে-পদ্ম নারী অর্পণ করে তার দেবতার ব্যক্তিত্বের চরণে। আর কাউকে নয়। নিখিলেশের সত্যান্বেষণ-সাধনা, পরম ক্ষতি ও চরম বেদনা ব'য়ে আনলেও তা' ব্যর্থ হয়নি। বিমলা মোহ-ঝড়ে দিশা হারিয়ে ধূলি-অন্ধ হ'লেও শেষ মুহূর্ত্তে তার সত্য-প্রেমের পরম আশ্রয়টি চিনে ফিরতে পেরেছিল। নিখিলেশ বুঝেছিল, মনুষ্যত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ-বরণীয় আর কিছু নেই। "সবার উপরে মানুষ সত্য"—এ সত্য নিখিলেশ যেমন উপলব্ধি করেছিল—আর কেউ করেনি। তাই সে বলেছে—"জীবনে মানুষ যা' কিছু হারায়, তা'র সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশী বড়—সমস্ত কান্নার সমুদ্র

পেরিয়েও তার পার আছে—এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদ্‌তও না।" (৭২ পৃঃ)

নিখিলেশ শুধু বিমলার প্রেমই যাচাই করে নি, নিজের প্রেমেরও করেছে। তা'র এ গভীর প্রেমের কঠোর তপস্যা ব্যর্থ হয়নি। বিমলা যখন আকুলচিত্তে দু'হাত দিয়ে নিখিলেশের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে' অশ্রু-ধৌত মুখে বার বার তা'র পা দু'খানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল – তখন নিখিলেশ সঙ্কুচিত হলেও বাধা দিতে পারেনি। তখন তা'কে নিজেকে নিজে উত্তর দিতে হয়েছিল—"আমি এ পূজায় বাধা দেবার কে? যে-পূজা সত্য, সে-পূজার দেবতাও সত্য, সে দেবতা কি আমি, যে, আমি সঙ্কোচ করবো? (২৮৬ পৃঃ)।

মানুষের ঐতিহ্যমুক্ত সামাজিক-মনের দুটি রূপ আছে। একটি জ্ঞান-পরিস্বচ্ছ, অসীম-অভিমুখী, নির্ম্মল-সুন্দর, নিরস্ত এবং সর্ব্ববিষয়ের স্বরূপের সন্ধানে সে চিরকালের উদাসী-পথিক।

যা 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ।

অন্যটি ঠিক তার বিপরীত। এই ঐতিহ্যমুক্ত মনের কাছে বাস্তবই সব। যা' বাস্তবে নেই, যা' স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা'র অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। বাস্তব জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাধাহীন ভোগই তা'র শ্রেষ্ঠ সত্য, এবং সেই ভোগস্পৃহাটি নিতান্ত স্থূল রকমের লালসার মধ্যে আপনার নগ্ন-মূর্ত্তিটি প্রকট করতে সঙ্কোচ অনুভব করে না, বরং সেটাই তা'র যৌবনের জয়যাত্রা—গৌরবের পরিচয় বলে' গর্ব্ব করে।

সভ্য-মানবের ঐতিহ্যমুক্ত মনের এই অন্য দিকটি হচ্ছে—'ঘরে-বাইরে'র—সন্দীপ।

মাষ্টারমশাই চন্দ্রবাবুর একটিমাত্র কথায় সন্দীপের স্বরূপটি ঠিক

ফুটে উঠেছে।—"সন্দীপ অধার্ম্মিক নয়, ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকেই গিয়ে পড়েচে।" (১২৬ পৃঃ)

সভ্য জগতে উগ্র বাস্তবতাবাদ, স্থূল ভোগবাদের যে তীব্র অভিযান চলেছে,—যার চক্রনেমিতলে নীতি, সংস্কার, ধর্ম্ম, সত্য, এমন কি প্রেম পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ ধূল্যবলুণ্ঠিত হ'চ্ছে, তারই সংহারমূর্ত্তির রূপ-বিগ্রহ—সন্দীপ। অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের সভ্যমানবের সংস্কারমুক্ত যৌবন-মনস্তত্ত্বের ভোগ-উদ্দাম রূপটির বিরাট শক্তি-সংহত মূর্ত্তির প্রতীক সে। ঝড়ের মত আপন শক্তির বেগে আপনি টলটলায়মান, বিক্ষুব্ধ। জীবনকে নিতান্ত স্থূলভাবে ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে বিশ্বে এমন কিছু নেই যা' সে অবলীলাক্রমে ছিঁড়তে, ছুঁড়ে ফেল্‌তে, ভাঙতে, দল্‌তে বা নষ্ট করতে না পারে। সংসারে সে চা[illegible] আনন্দকেই মানে। 'দেওয়া'র মধ্যে আনন্দ বা সার্থকতার অস্তিত্ব মানতে চায়না এবং খুঁজ্‌তে জানে না। মুগ্ধতা যা'র কাছে উপেক্ষণীয় এবং মত্ততাই প্রার্থনার বস্তু, সৃষ্টির আনন্দের চেয়ে বিনাশের আনন্দই তাকে বেশী আকর্ষণ করে।

ঐতিহ্যকারা হ'তে মুক্তি অর্জ্জন করে' নিখিলেশ পেয়েছিল, আত্মার স্বাধীনতা। পরিস্বচ্ছজ্ঞানে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করে' সে প্রকৃত 'স্ব' অর্থাৎ আত্মা'র অধীন হ'য়ে—সত্যকে লাভ করেছিল।

মাষ্টার মশাইয়ের কথায়—'পুর্ণিমার চাঁদ'।—

সন্দীপ ঐতিহ্যকারা হ'তে মুক্ত হ'য়ে—পেয়েছিল কামনার স্বেচ্ছাচারিতা। তা'র নির্ব্বিচার প্রবৃত্তি তা'কে যে-পথে পরিচালিত করেছে সে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারবশে সেই বিনাশ-পথের উদ্দাম-পথিক হ'য়েছে। মিথ্যাকে সত্য করে' গড়ে' তোলাতেই ছিল তার সৃষ্টির আনন্দ।—সে চাঁদই, কিন্তু পূর্ণিমার নয়, অমাবস্যার।

সন্দীপ বুঝেছিল—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' এই রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ ভরা সুন্দরী পৃথিবী চিরকাল শক্তিমানেরই ভোগের সামগ্রী। সে জেনেছিল সত্য ও মিথ্যার মূলতত্ত্ব কিছুই নেই। সত্য কিম্বা মিথ্যার স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা—পলাণ্ডুর খোসা ছাড়িয়ে বীজ আবিষ্কার চেষ্টার মতই ব্যর্থ। শেষ পর্য্যন্ত নিঃশেষে গিয়ে পৌঁছুবে তবু বীজ বা আঁটি কিছু পাওয়া যাবে না। আস্ত পলাণ্ডুটির সত্য ও অস্তিত্ব ঐ খোসার সমষ্টি নিয়েই। তা'কে পৃথক ভাবে খুলে ফেলে বিশ্লেষণ করতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সবই খোসা হ'য়ে যাবে।

তাই 'অপরিবর্ত্তনীয় সত্য' বা 'নিত্য-সত্য' কথাটা তা'র কাছে ছিল মস্ত বড় ফাঁকি। সে জান্‌ত, একযুগে যা' পরম সত্য অন্যযুগে তাই-ই চরম মিথ্যা। একজনের কাছে যা' নিতান্ত সত্য অপরের কাছে তাই-ই একান্ত মিথ্যা। সন্দীপ বুঝেছিল,—যে শক্তিমান, সে নিজেই নিজের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনানু[illegible]ী [illegible] সৃষ্টি ক'রে [illegible]। নিজের দৃঢ় প্রভাব শক্তি দ্বারা, প্রদীপ্ত পৌরুষ-জ্যোতিঃতে কুৎসিতকে পরম সুন্দর, মিথ্যাকে উজ্জ্বল সত্য করে' তোলাটাই ছিল তার ব্যক্তিত্বের পৌরুষ-গৌরব। বাস্তবে যা' নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভোগ, তা'কেই খুব প্রচুর ভাবে—এবং মোটা রকমে পাওয়া ছিল তার সাধনা।

নিজের প্রচণ্ড পৌরুষ-শক্তির সম্মোহনজাল রচনা করে' সেই ঊর্ণনাভজালে সে অবলীলাক্রমে নারীকে আকর্ষণ করে' এনে ফেলেছে—ঐশ্বর্য্য আকর্ষণ করে' এনেছে,—দেশবাসীকে আকর্ষণ করে' এনে জড়িয়ে ফেলেছে।

সে নারীকে ভালবাসত প্রেমের জন্য নয়, নিজের জন্য। অর্থকে ভালবাসত দেশের প্রয়োজনে বা মহৎ প্রয়োজনে নয়, নিজেব প্রয়োজনে। দেশকে ভালবাস্‌ত, দেশের জন্য নয়, নিজেরই জন্য। মিথ্যা নিয়েই

তার কারবার ছিল বটে, কিন্তু একটি জায়গায় সে খাঁটি ছিল। সে নিজেকে চিন্‌ত। সে নিজে যে কি, তা সকলের কাছে আবৃত থাকলেও, তা'র নিজের কাছে আবৃত ছিল না।

সন্দীপের মধ্যে মিথ্যা বিশেষ ছিল না, সত্যই ছিল—কিন্তু সে সত্য—বিকৃত সত্য, কুশ্রী সত্য, অশুভময় সত্য—প্রলয়ঙ্কর সত্য। কিন্তু এই অসুন্দর-সত্যবাদী সন্দীপেরও মাঝে একদিন সুন্দর-সত্যের রম্য আভাস ক্ষীণতররেখায় ফুটে উঠেছে। সেইদিনই কিন্তু সে আমাদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হ'য়েছে।

যাবার পূর্ব্বে সন্দীপের মত মানুষকেও উপলব্ধি করতে হয়েছে—সংসারে শুধু 'নেব' ইচ্ছা করলেই হয় না—অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন কোনও একস্থানে রিক্ত হ'য়ে দিয়ে যেতেই হয়। এই চিরমুক্ত, বিনাশ-পথের উদ্দাম পথিক, ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎগর্ভ-বজ্রের মত ভয়ঙ্কর-সুন্দর মানুষটির মুখ—তা'র বিদায় মুহূর্ত্তের কথা ক'টি আমাদের একান্তই বিস্মিত করে' দেয়।—"মক্ষিরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা 'কিন্তু' এসে ঢুকেচে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই, রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে' দেখেচি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়। তা'র দায় মিটিয়ে না দিয়ে সন্দীপের নিষ্কৃতি নেই।" (২৮৯ পৃঃ)

বিমলার অন্তরের দ্বারে নিখিল ও সন্দীপ দু'জনে এসে দাঁড়িয়ে, তার অন্তরের প্রেম ও মোহ এই দু'টি বৃত্তিকে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত করেছে। একজন বিমলার অন্তরের নিবিড় গভীরতাকে একান্ত আহ্বান করেছে,—অন্যজন বিমলার অন্তরের দিশাহারা উন্মাদনাকে তীব্র আকর্ষণ করেছে।

(নারীর স্বকীয়-সত্তা সুতীব্র, প্রগাঢ়—(intense),—তাই সন্দীপের উগ্র প্রাবল্য বা পৌরুষের প্রচণ্ডতা তা'কে মোহাবিষ্ট ক'রে আকৃষ্ট

করেছে। পুরুষের স্বকীয়-সত্তা,—বিস্তৃত, ব্যাপক (wide)। পুরুষের যেটি প্রকৃত সহজসত্তা,—নারী ভালোবাসে তা'কেই। তাই সন্দীপের আত্যন্তিকতা, ক্ষণ-উন্মাদনা-বশে বিমলার ভালো লেগেছিল সত্য, কিন্তু নিখিলের নিঃশব্দ মৌন-অতল প্রেম ও অপরিসীম ঔদার্য্যকেও সে আপনার অজ্ঞাতেই ভালোবেসেছিল। এই ভালো-লাগার মূলে আছে মোহের প্রভাব এবং ভালোবাসার মূলে আছে প্রেমের পরম-স্পর্শ।

প্রেম—সত্য শিব সুন্দর ঈশ্বরেরই প্রতীক। সাধনার মধ্যদিয়ে তপস্যার মধ্যদিয়ে তবে তা'র (প্রেমের) স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

নিখিলকে আপন প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধির কঠিনতর তপস্যা করতে হয়েছে। বিমলাকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন-প্রেমের স্বরূপ চিন্‌তে হয়েছে। "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো"—"হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে, মনের আলোচনা দ্বারা তাঁর অভিপ্রকাশ ঘটে।" 'ঘরে বাইরে'র প্রেম-সাধনার মূল তত্ত্ব ঐ—"হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো"। নিখিল ও বিমলা উভয়েই এই তত্ত্বের মধ্যদিয়ে আপন অন্তরস্থ প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছে। আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ প্রেমের স্পর্শ লাভ করতে পেরেছে।

বিমলাকেই সইতে হয়েছে বড় ভয়ঙ্কর। সন্দীপের উগ্র আকর্ষণের অনলকুণ্ডে তা'র প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। এ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের দাহ হ'তে তাকে নিখিলের নিষ্কাম প্রেমও ঠিক রক্ষা করতে পারেনি;—রক্ষা করেছে তা'র নারী-অন্তরের বিগলিত মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ অমৃতধারা। রক্ষা করেছে কিশোর-বালক অমূল্য!

প্রেমের সঙ্গেই তো মোহের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। প্রেমকে আচ্ছন্ন করে', প্রেমকে হতচৈতন্য করে'—তারই আসন অধিকার করার প্রবণতা—মোহের সহজ প্রকৃতি। তাই প্রেমকে পরাজিত করে'ও

নারীজীবনে মোহকে অধিক সক্রিয় শক্তিশালী হ'তে দেখা যায়,—কিন্তু মোহ অনেকসময় পূর্ণপরাজিত হ'য়ে থাকে,—নারীর মাতৃস্নেহেব অমৃত-চন্দ্রালোকের কাছে। এই মাতৃস্নেহের পীযূষধারায় নারীর মোহাচ্ছন্নপ্রেম, বিস্মৃতপ্রেম, এমন কি মৃতপ্রায়প্রেমও উজ্জ্বল দীপ্ত ও স্বপ্রকাশ হ'য়ে ওঠে।

নারীর জীবনে মোহ ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপ চিনিয়ে দিতে পারে,—তা'র অমূল্য মাতৃস্নেহই।

যে তিনটি চরিত্র নিয়ে এ পর্য্যন্ত আলোচনা করলাম—'ঘরে বাইরে'র এই প্রধান চরিত্র তিনটি তা'দের আপন আপন উক্তি দ্বারা—পুস্তকখানির মধ্যে বেশ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠ্‌তে পেরেছে। এদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে সমালোচকের সূক্ষ্ম-রসবোধ ও গ্রহণশক্তিকে খুব বেশী সচেতন ও সক্রিয় করে' তোলা'র তেমন প্রয়োজন হয় না; যেহেতু এরা নিজেরাই নিজেদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে' গিয়েছে। তা'দের চিন্তা এবং ভাবধারার বিকাশ, বর্দ্ধন ও পরিণতি তা'রা নিজের মুখেই প্রকাশ করায় চরিত্রগুলি স্বতঃই সুপরিস্ফুট হয়েছে।

এর মধ্যে আরও দু'টি বিশেষ চরিত্র আছে। একটি মাষ্টাব মশাই চন্দ্রবাবু,—অন্যটি, নিখিলেশের বিধবা ভ্রাতৃজায়া মেজরাণী।

মাষ্টার মশাইয়ের প্রকৃতি ও চরিত্র এত বেশী স্বচ্ছ ও সুপরিব্যক্ত যে, তাঁর সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা বা পরিকল্পনাকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। কারণ, তিনি যা,—তাই হ'য়ে সুস্পষ্টতার মধ্যদিয়ে নীরবে শান্ত সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছেন। দ্বিতীয় চরিত্র মেজরাণীর মধ্যেই একটু বিশেষত্ব আছে।

মেজরাণীর এই বিশেষত্বটুকু তার নিতান্ত সহজত্বের আড়ালে এমনই আত্মগোপন করে' রয়েছে যে তা' সহজে কারুর চোখে পড়ে না। এই জন্যই যেন এর মাধুর্য্য আরও বেশী হ'য়ে উঠেছে।

বনের ভিতরে ঘনপাতার আড়ালে অজানা অনামা ফুলটির মত, এই সুন্দর শুভ্র মধুর নারী-অন্তরটি এমনই সহজ নীরবতায় অনাড়ম্বরে ফুটেছে যে, তার মনোরম মাধুর্য্য-সুরভি আমাদের মর্ম্মের মর্ম্মতলে একটি বেদনা-করুণ ভাববাষ্প পুঞ্জীভূত করে' তোলে। তখন আমরা এই নারী অন্তরটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবো না একে শ্রদ্ধা করবো—ঠিক করে' উঠ্‌তে পারিনে।

সংসারে এমন অনেক বস্তু ও বিষয় আছে যা' সদা-সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টির সামনে নিতান্ত সহজ হ'য়ে রয়েছে,—তা'র মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্যটুকু হয়তো আমাদের কাছে চিরদিনই প্রচ্ছন্ন এবং অজ্ঞাত থেকে যায়।

সাগর-বেলায় লক্ষলক্ষ শূন্যগর্ভ শুক্তির সঙ্গে মুক্তাগর্ভ শুক্তিটিরই মত সে বৈশিষ্ট্য শূন্য নিতান্ত সাধারণ, সহজ; যা পায়ে ঠেকলেও পথিক একবার মাত্র হয়তো অন্যমনস্ক দৃষ্টিস্পর্শ ক'রে নিরুদ্বেগেই চলে যায়। কোনও ঔৎসুক্য জাগেনা লক্ষ্য করবার জন্য যে সেই অতি সাধারণ ঝিনুকটুকুর মধ্যে স্বাতী-নক্ষত্রের বারিবিন্দু জমে' রত্ন হ'য়ে আছে কিনা।

মেজরাণীর নামটি পর্য্যন্ত আমরা জানিনা। শুধু জানি, এই ভাগ্য-বঞ্চিতা নারীর উৎসবরাত্রির সন্ধ্যাক্ষণেই উৎসব-সমারোহ মিটে গিয়ে—রূপ-যৌবনের বাতিগুলি শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে' মিছে জলছিল। কোথাও সঙ্গীত ছিল না, শব্দ ছিল না, ছিল শুধু জলা।—

কিন্তু এ জলা'র মধ্যে একটুও দাহ'র সৃষ্টি হয়নি, কালিমা উৎপন্ন হয়নি,—আলোই বিকীর্ণ হয়েছে। হোক শূন্যসভা—হোক্ নিঃশব্দ আসর,—সেই নিঃশব্দ-শূন্যতাকে সে আপনআলোয় সুন্দর ক'রে তুলেছে,—নিঃশব্দতার মাঝেই অনাহূতের ধ্বনি শুনেছে,—এইখানেই তা'র কৃতিত্ব-গৌরব।

আজীবন সর্ব্বসুখ-ভোগ-বঞ্চিতা, স্বামীপুত্রহীনা বিধবা নারী—তাঁর অন্তরের সমস্তটুকু স্নেহরসসিঞ্চনে, একান্ত নিঃশব্দে যাকে ভালোবেসেছিলেন,—তা'কে যে তিনি কতখানি ভালোবাসতেন, সে কথা কেউই জান্‌বার বা চেনবার অবকাশ পায়নি। তাঁর এই ভালোবাসা-শুক্তি-গর্ভে, মমতাময়ী মায়ের কোমল প্রাণখানি, স্নেহময়ী অগ্রজার স্নিগ্ধ হৃদ্যতা ও অকৃত্রিম বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি-মাধুর্য্যটুকু—স্বাতী-বারিবিন্দুর মত পুঞ্জীভূত হ'য়ে জমাট্ বেঁধে মুক্তা-রত্ন সৃষ্টি করেছে। নিখিলেশের প্রতি মেজরাণীর মমতাব্যাকুল ভালবাসা—মুক্তারই মত শুভ্র, উজ্জ্বল, সুন্দর। কোথাও ম্লানতা-লেশ নেই,—প্রাণের অতলসমুদ্রতলে মরমের শুক্তিগর্ভে গভীর গোপন তার অস্তিত্ব।

জীবনের বিরাট ব্যর্থতা, কেঁদে কাটিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, হেসে কাটিয়ে দেওয়াই কঠিন। এই কঠিনের সাধনায় মেজরাণী সহজসিদ্ধি লাভ করেছেন।—চতুঃপার্শ্বে ঐশ্বর্য্য ও ভোগের উৎসব-সমারোহের মধ্যে, এই সর্ব্বসুখবঞ্চিতা যুবতীকে একদিনের তরেও বিষণ্ণা বা ম্রিয়মাণা দেখা যায়নি। নিজের জীবনের দুঃখ ও ব্যর্থতার বেদনামেঘ একদিনও বাইরে ফুটে উঠ্‌তে কেউ দেখেনি। হাসি ও রহস্যের কিরণ-ঝিলিমিলি—স্বচ্ছ অথচ পুরু আবরণে তাঁর অন্তরের রূপটি চিরদিনই প্রচ্ছন্ন র'য়ে গেছে। মেজরাণী তাঁর বড় জায়ের মত বৈরাগ্যের ফাঁকিতে জীবনের ব্যর্থতা-লজ্জা ঢাক্‌তে চা'ননি। তাঁর অন্তরের সহজসত্যের রূপটিকে কোনওখানে, বাইরের রং মাখিয়ে বিচিত্র ও মহৎ করে' তুলবার প্রয়াস তাঁর আদৌ ছিল না। এই জন্য তিনি বিমলার অন্তরে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করতে পারেননি,—পাঠকদের কাছেও হয়তো উপযুক্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।

বিধবা বড়রাণীর সঙ্গে মেজরাণীর প্রকৃতির তাই সম্পূর্ণ পার্থক্য

ছিল। মেজরাণী—"সাত্বিকতার ভড়ং কর্‌তেন না। বরং তাঁর কথাবার্ত্তায় হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল।" মেজরাণী সাবান-মাখার অভ্যাস ছাড়্‌তে পারেননি। সদাসর্ব্বক্ষণ তাঁর জিহ্বাগ্রে রহস্যবিদ্রূপ ঠাট্টাতামাসা লেগেই আছে,—কথায় কথায় মধুর রসের সঙ্গীত কল-কণ্ঠে গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে।

স্বামীকে তিনি পাননি,—সন্তানের স্নেহাস্বাদ তাঁর জীবনে ঘটেনি। নারীজীবনে স্নেহ, প্রেম, মমতা, সাধ, আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই অপূর্ণ ও অতৃপ্ত ছিল—অথচ তাদের তৃপ্ত ও সার্থক করে' তোলার উপাদান ছিল না। নিখিলেশের মাঝেই তাঁর সমস্ত অন্তরের স্নেহ ও প্রীতি কেন্দ্রীভূত হ'য়েছিল। নিখিলেশের কাছে অনর্গল বকুনিচ্ছলে কথা ক'য়ে - তারই মাঝে তাঁর অন্তরের একান্ত পরম সত্যকে সযত্নে আড়াল করে' রেখেছেন,—কিন্তু তবুও তারই মাঝে কখনও কখনও সেই সত্যের জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ একটু আধটু প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।—"তোমারি যদি চুরি যায়, সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেচেন, তার মূল্য বুঝি আমি বুঝিনে? আমি ভাই তোমাদের বড়রাণীর মত দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাক্‌তে পারিনে, দেবতা আমাকে যা দিয়েচেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশী।" (২০৩পৃঃ)

মেজরাণীর ভালবাসার বিশেষত্ব হচ্ছে—নিখিলেশকে তিনি বাইরের সামাজিকজীবনে যে রূপে পেয়েছিলেন,—সে রূপ থেকে নিজের অন্তর-বাহির কোনওখানেই বিভিন্ন মূর্ত্তি করে' গড়ে তোলেননি। দেবরের স্নেহের মধ্যেই তাঁর নারী-অন্তরের অপূর্ণ মাতৃস্নেহ, অতৃপ্ত প্রীতি মমতা আত্মত্যাগ—যা' কিছু সবই দানা বেঁধে উঠেছিল।

ছ'বছরের দেবর নিখিলেশের সঙ্গে ন'বছরের ভ্রাতৃজায়া মেজরাণীর

পুতুলখেলায়,—কাঁচা আমের অপথ্য আচার তৈরীর মধ্যদিয়ে—যে স্নেহ-সান্দ্র অপূর্ব্ব প্রীতি নিজেদের অলক্ষ্যে অন্তরতলে ঘনিয়ে উঠেছিল,—জীবনের ক্রমবিবর্ত্তনে নিখিল তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'যে অনেকদূরে সরে' গেলেও—এই প্রিয়জনহীনসংসারে একান্তএকাকিনী ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীটির পক্ষে তা' সম্ভব হয়নি। তাঁর মৌনভালবাসা নিঃশব্দেই তাঁর আশৈশবের স্নেহাস্পদটিকে মর্ম্মের তলেতলে গভীর পাকে জড়িয়ে উঠেছে—একান্ত নিঃস্বার্থ স্নেহরসে তাকে পুষ্ট করে' তুলেছে। বাহিরে তাঁর ভালবাসার রূপটি ছিল নিতান্ত লঘু ও কৃত্রিমতাপূর্ণ। বৈষয়িক স্বার্থের প্রয়োজনেই যেন মেজরাণী নিখিলেশের সঙ্গে স্নেহাভিনয় করেন। তার মনস্তুষ্টির জন্য, হীন কপটতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেও যেন তাঁব দ্বিধা নেই বলে' মনে হয়!

তাই বিনা আহ্বানে বিনা অনুরোধে নিখিল-বিমলার সঙ্গে কলিকাতা-যাত্রায় প্রস্তুত মেজরাণীর প্রতি নিখিলেশ অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করায়,—সেই একটিদিনমাত্র মেজরাণীকে তাঁর সদা-রহস্য ছলনা-লিপ্ত লঘুহাস্যের বোরকা খানি নামিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে শুনেছি—"ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদেব জন্য। আমরা মেয়েরা বাঁধ্‌তে চাই, বাঁধা প'ড়্‌তে চাই।...আমাদের বোঝা হ'চ্চে ছোট-জিনিষের বোঝা। যাকেই বাদ্‌ দিতে যাবে, সে'ই ব'ল্‌বে, আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা! এমনি করে' হাল্‌কা জিনিষ দিয়েই আমরা আমাদের মোট ভারী করি।" (২৭১ পৃঃ)

বিমলাকে মেজরাণী যে খুব ভালোবাসতেন তা' নয়। বরং তাব প্রতি ঈষৎ ঈর্ষার ভাবই ছিল। ভালোবাসার এই স্বাভাবিক ঈর্ষাটুকু তাঁর ভালোবাসার সংকীর্ণতা প্রমাণ করে না, বরং তাঁর ভালবাসার গভীরত্বেরই পরিমাপ করে। এ ঈর্ষাটুকুর মধ্যে কলুষ নেই, কালি

নেই।—কারণ, তা' হ'লে মেজরাণী সন্দীপের সঙ্গে বিমলার অবাধ দেখা-সাক্ষাতে অন্তরে অন্তরে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌তেন না—এবং দরোয়ানকে বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি করে' আসন্ন-অশুভের যাতে পরিসমাপ্তি ঘটে তার চেষ্টা ক'রতে চাইতেন না। সন্দীপের সঙ্গে বিমলার নির্জ্জন-আলাপে উৎপাত ঘটাবার জন্য, ইচ্ছা করে' ক্ষেমা ও থাকো দাসীর মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিয়ে, বৈঠকখানায় বিমলার কাছে নালিশ করতে পাঠাবার প্রয়োজন হ'ত না।

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন-গভীর শুভকামনা, এই কল্যাণপ্রচেষ্টা তাঁর,—নিখিলেশের প্রতিই শঙ্কা-ব্যাকুল স্নেহ হ'তে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে,—বিমলা'র প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহে নয়, তা' অবশ্য মানতে হবে। নিখিল যে বিমলাকে কতো ভালবাসে—মেজরাণী তা' জান্‌তেন। তাই তিনি মোহাকৃষ্টা বিমলাকে নিখিলের পানে ফেরাতে চাইতেন। যেহেতু,—বিমলার উপরেই যে তাঁর পরমপ্রিয় স্নেহাস্পদটির জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা অনেকখানিই নির্ভর করছে।

মেজরাণীর ভালবাসা কতখানি যে নিঃস্বার্থ ও প্রচ্ছন্ন, সেইদিনই নিখিলেশের কাছে কতকটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—যেদিন বিধবামেজরাণী তাঁর ন' বছর বয়সে প্রবেশকরা শ্বশুর-স্বামীর ভিটা ত্যাগ করে'—দেবর ও জায়ের কলিকাতা-যাত্রা রূপ অজানার উদ্দেশে ভাসানো তরীতে উঠবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বিনা-নিমন্ত্রণে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। অথচ তার কারণটি কিছুতেই মুখ ফুটে বল্‌তে বা ইঙ্গিতেও জানাতে চাইলেন না। তুচ্ছ ছুতো মিথ্যা কৈফিয়তে তাঁর সেই পরমবেদনার একান্তগভীর কথাটি ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে চাইলেন।

মা বাপের ক্রোড় ছেড়ে বালিকা-বয়সে যে আশ্রয়নীড়ে এসেছিলেন, এই সুদীর্ঘকাল যে বাড়ীর বাইরে তিনি একটি দিন কখনও কাটান্‌নি,

সেই চিরাভ্যাসের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, জীবনের সকল সুখ-দুঃখের স্মৃতি-সুরভি-জড়ানো, গৃহকর্ত্রীর সম্মানিত আসন পাতা—আপন অধিকারের গৌরবময় স্থানটি—সংস্কার ও সুবিধার আকর্ষণ কাটিয়ে—ত্যাগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হওয়া,—সে যে কতখানি পরমবস্তুর বিনিময়ে সম্ভব হ'তে পারে,—নিখিলেশ ও বিমলার সেদিন আর বুঝ্‌তে ভুল হ'ল না।

সেইদিন তাঁর ঘরময় ছড়ানো বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দণ্ডায়মান নিখিলেশের কাছে এই সত্যটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল যে,—এই ভাগ্য কর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবলএকটিমাত্র যে-সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তা'র বেদনা কত গভীর! টাকাকড়ি, ঘরদুয়ারের ভাগ, সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলা ও নিখিলেশের সঙ্গে তাঁর যে বার বার ঝগড়া হ'য়ে গেছে, তার কারণ বৈষয়িকতা নয়। তার কারণ, তাঁর জীবনের এই একটি মাত্র সম্বন্ধের উপরে তাঁর দাবি তিনি প্রবল কর্‌তে পারেননি।

নিখিলেশের উপরে মেজরাণীর দাবী যে, কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবী নয়, তার চেয়ে অনেকবেশী গভীর—একথা বিমলাও বুঝেছিল। তাই ওদের সম্বন্ধটির প্রতি বিমলারও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার অস্তিত্ব ছিল।

সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী—মেজরাণীর কপট অভিনয় বা কৃত্রিম উপায়ে নিখিলেশের মনোরঞ্জন-প্রচেষ্টা। এই মধুর ছলনাটুকু তাঁর অন্তরের স্বর্গীয় স্নেহের অপূর্ব্ব আভাস আরও সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। যেহেতু স্বার্থাভিসন্ধির ঘৃণ্য কুটিল মনোবৃত্তি হ'তে এ ছলনার উদ্ভব নয়।

মেজরাণী দেবরের কাছে হাঁপিয়ে গিয়ে নবাবিষ্কৃত দেশীসাবান চেয়েচিন্তে নেন,—'নিজে গায়ে মাখবেন বলে'। কিন্তু পরোক্ষে তা'তে কাপড় কাচাই চলে,—গায়ে মাখেন পূর্ব্বেকার বিলাতী সাবানই মাথার দিব্য দিয়ে অনুরোধ ক'রে দেবরের কাছথেকে দেশীকল

বনাম দাঁতন কাঠির বাণ্ডিল আনিয়ে নেন,—কিন্তু লেখবার দরকার হ'লে বাক্সর ভিতর হ'তে হাতীর দাঁতের সৌখীন কলমটি বে'র করে' লেখেন। ঠাকুরপোর সামনে তাঁর দেশীকাঁচির নামে জিভে জল আসে,—অথচ সেলাইয়ের বেলায় বিলাতী কাঁচিই চলে। এ প্রতারণা, এ কপট ছলনার জন্য বিমলা তাকে ঘৃণা করলেও নিখিলেশ তা পারেনি। কারণ, এর অন্তর্নিহিত মূলসত্যের পরমরসটি বিমলা স্পর্শ করতে না পারলেও নিখিলেশের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। এই প্রতারণা, এই ছলনার মূলে—একটি মমতা-উদ্বেল হৃদয়ের কতখানি প্রগাঢ় স্নেহরস গোপনসঞ্চিত রয়েছে,—সমস্তটুকু না বুঝ্‌তে পারলেও কতকটা বোধ হয় নিখিলেশ বুঝ্‌ত।

এই ছলনার মূলে তাঁর নিজেকে নিখিলেশের সুদৃষ্টিভূত কর্‌বার মনস্তত্ত্ব ছিল না—নিখিলেশকে সুখী করবার—নিখিলেশের মুখে ক্ষণিকের তরেও উৎসাহদীপ্তি, সানন্দহাসিটুকু দেখ্‌বার তৃপ্তিটুকুই এর মূল-মনস্তত্ত্ব।

নারী যাকে ভালোবাসে, তাকে সুখী করবার জন্য, তৃপ্ত ও আনন্দিত কর্‌বার জন্য যে মধুর ছলনাটুকু করে,—সে ছলনা, ছলনা হ'লেও ক্ষেত্রবিশেষে সত্যের চেয়েও শ্রদ্ধেয় ও সুন্দর। যেহেতু তার মূলে রসসিঞ্চন কর্‌ছে নারীর অন্তনিহিত পরমসত্য—প্রেম, স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা। তা'তে প্রিয়জনকে সুখী করবার স্বতঃপ্রবণতা ছাড়া অন্যকোনও কলুষ-কামনা বা গোপন-স্বার্থাভিপ্রায় নেই। ললনার ছলনা তখনই হ'য়ে ওঠে ঘৃণ্য, কুশ্রী,—যখন ছলনা অন্তরের গভীর প্রেম-সুধা হ'তে অমৃতরূপে উৎসারিত না হ'য়ে—মিথ্যা হ'তে গোপন-স্বার্থাভিসন্ধি হ'তে উদ্ভূত হয়।

তাই বিমলা যখন অশ্রদ্ধাভরে স্পষ্ট ক'রেই বলেছে——"যাই বলো পেটে এক, মুখে আর ভালো নয়।" মেজরাণী তখন অকুণ্ঠচিত্তেই

বলেছেন—"তা'তে দোষ হ'য়েছে কি? কত খুশী হয় বল্ দেখি! ছোট বেলা থেকে ওর সঙ্গে যে এক সঙ্গে বেড়েচি, তোদের মত ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে।" (১০৯ পৃঃ)

নিখিলেশ প্রজাবিদ্রোহ-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—মেজরাণী ছুটে এসে বিমলার ঘরে ঢুকে বিমলাকে গাল দিচ্ছেন—রাক্ষুসি! সর্ব্বনাশি! নিজে মরলিনে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি?—

সে মুহূর্ত্তে তাঁর আশৈশবের অভ্যস্ত লজ্জা, সম্ভ্রম বোধ—সমস্তই অনায়াসে খসে' পড়েছে। দেওয়ানবাবুর সামনে বেরিয়ে নিজের মুখে বল্ছেন—"মহারাজকে ফিরিয়ে আন্তে শীগ্‌গীর সওয়ার পাঠাও।...... তাঁকে ব'লে পাঠাও, মেজরাণীর ওলাউঠো হয়েছে,—তাঁর মরণকাল আসন্ন।"

পতিপুত্রহীনা সংসারের সর্ব্বস্বরিক্তা নারীর অন্তর্নিগূঢ় বিশ্বাস-শতদল আজ বিপদের মুহূর্ত্তে বাইরে বিকচ হ'য়ে উঠলো। মেজরাণীর ওলাউঠো হ'য়েছে—মৃত্যুকাল আসন্ন জান্‌লে,—সংসারে এমন একজন আছে যে সব কাজ ফেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসবেই।

সূর্য্যাস্তের শেষরশ্মিরেখাটিও মিলিয়ে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে।

বিমলা পথের ধারে জানালায় বসে' তার ভাগ্যের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে—রুদ্ধনিঃশ্বাসে নিখিলেশের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করছে।

এই ভাগ্য-প্রতীক্ষা ছেড়ে উঠে গিয়ে বাক্স খুলে অমূল্যর দেওয়া ভাইফোঁটার প্রণামীটিও হাতে ক'রে নিয়ে এসে বসে' থাকতে তা'র শক্তি নেই।......তখন ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছে। বিমলা জানে,—এই চরম বিপদের মুহূর্ত্তে মেজরাণী জানালায় ব'সে বিমলার মত ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছেননা,—ঠাকুরঘরে বসে' জোড়হাতে মুদিতনয়নে তপস্যা করছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

চিত্রায় দুইটি কবিতা আছে, একটি 'অন্তর্যামী', আর একটী 'জীবন-দেবতা'। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সুমধুর একটী রহস্য এই কবিতা দুইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে ব'সি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি ব ল তাই
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে। (চিত্রা)

এই কৌতুকময়ীটি কে ? কে এই রহস্যময়ী কবির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গানে কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতেছে ; কবির নিজের কোনো কথা নাই, কোনো ভাষা নাই, সব এই কৌতুকময়ীর রহস্য লীলা ! অথবা—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম— (চিত্রা)

এই অন্তরতমই বা কে? কাহাকে তিনি দলিত দ্রাক্ষার মতন সমস্ত বুক নিঙড়াইয়া দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন? কবি বলিয়াছেন, এই অন্তরতম, এই কৌতুকময়ীই তাঁহার অন্তর্যামী, তাঁহার জীবনদেবতা! কবির অনুভূতি সত্যই একটু অদ্ভুত! এই কৌতুকময়ী অন্তর্যামীকে তিনি নিজে খুঁজিয়া বাহির করেন নাই, অন্তরতম জীবনদেবতা নিজে তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন; অথচ কবির যাহা কিছু নর্ম্ম কর্ম্ম সকল কিছুর দেবতা এই অন্তরতম; কবির গানে কবিতায় যাহা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে তাহা এই অন্তরতমেরই পূজার জন্য। কবির জীবনটি যেন একটি বীণা; সে বীণার সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন জীবনদেবতা, রাগিণী রচনা করিয়া দিয়াছেন তিনি, কিন্তু গান ফুটাইয়া তুলিতে দিয়াছেন কবিকে। তবে কি এই 'জীবনদেবতা' 'অন্তরতমে'র অধিষ্ঠান কবির মনের মধ্যে—তিনিই কি কবির সমস্ত অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ভাষায় কবিতায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছেন, গানের সুরে ঝঙ্কৃত হইতে চাহিতেছেন? তাঁহার ক্ষণিক খেলার লাগিয়াই কি প্রতিদিন বাসনার সোনা গলাইয়া গলাইয়া নিত্যনূতন মূর্ত্তি রচনা করিতেছেন? বুঝি বা তাহাই হইবে—বুঝি বা অন্তরের মধ্যে সুতীব্র একটা অনুভূতি দেবতার রূপে তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে। বুঝি তিনিই আবার কখনও দেবীর রূপ ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং কবি তাঁহারই চরণে দীন ভক্তের অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছেন—

দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি

মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি।

* * *

তুমি যদি দেবী পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল·
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি।
সব হ'তে তবে সার্থক হ'বে
ব্যর্থ সাধন খানি।

'জীবনদেবতা'র আর এক রূপ সন্দেহ নাই, তবু জীবনদেবতা-ই বলিতে হইবে এই দেবীকেও ; কবিজীবনের যত অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল যত বাসনা সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় সমস্ত সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই জীবন-দেবতা কে ?

মানুষের মনে একটা সৃষ্টির প্রেরণা আছে। মানুষ গানে কবিতায় চিত্রে ভাস্কর্য্যে শিল্পে সাহিত্যে চিন্তায় কর্ম্মে যাহা কিছু প্রকাশ করে তাহার মূলে রহিয়াছে এই সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণাই তাহাকে সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে—ইংরেজীতে ইহাকে বলা হইয়াছে creative impulse। জীবনের মূলে সৃষ্টির এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে তিনটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই অনুভূতিটিই রসে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির এই প্রেরণাই তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, সমস্ত কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করে ;—এই প্রেরণাই নিরন্তর তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সৃষ্টির এই যে প্রেরণা, এই যে creative impulse, ইহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ? এই প্রেরণা কি আপনিই মনের মধ্যে জাগে? বাহির হইতে কিছুই কি এ প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করেনা? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃষ্টির যে এই প্রেরণা, যে প্রেরণাকেই তিনি বলিয়াছেন কৌতুকময়ী অন্তর্যামী, সে প্রেরণা কি আপনা হইতে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, বাহিরের কিছু কি তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই? মনে হয় তাহা নহে। তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন্‌টা সত্য, বলিতে পারিনা; কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির এই প্রেরণা আপনা হইতে মনের মধ্যে জাগে না; মন যে শুধু আপনা আপনি বাহিরের এই বিশ্ব-জীবনের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যকে দেখিয়া ও ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা নয়; বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা মনের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে। মানুষের মন এবং বাহিরের এই বিশ্বজীবন এই দু'য়ের মিলনালিঙ্গনেই মানুষের মনে সৃষ্টিপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রেরণা বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই যেন মনে হয়। বাহিরের জীবনের যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে মনের মধ্যে আমরা একটি অখণ্ডরূপে ভোগ করি, সেই ভোগানুভূতিটাই যেন আমরা ভাবে ও কথায় ফুটাইয়া তুলিতে চাই।

তাহা হইলে দেখিতেছি, সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে একটা উৎস আছে; এই সৃষ্টি-প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে একটা অনুভূতি—এই অনুভূতিকেই কবি যেন তাঁহার জীবনের অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি মনে করেন, যে গান তিনি রচনা করেন, যে কথা তিনি বলেন, যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা এই অনুভূতির—এই creative impulseএর কৃপায়! এই অনুভূতিকেই তিনি সুখ-দুঃখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন; এবং সর্ব্বশেষে

তাহাকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, এত যে তোমায় দিলাম, এত যে তোমার পূজা করিলাম, হে আমার অন্তরতম, তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি? এই অনুভূতিই আবার তাঁহাকে নিত্যনূতন কৌতুকে মাতাইয়াছে—ইহাকেই তিনি কৌতুকময়ী অন্তর্যামী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই অনুভূতি যখন প্রবল হইয়াছে, যে মুহূর্তে মনে হইয়াছে "আমার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একজন অন্তরতম বসিয়া আছেন, তিনি অন্তরের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছেন সকল কথায় ও কর্ম্মে—সেই মুহূর্তে কবি তাহার খেলার পুতুল হইয়া গিয়াছেন, একান্ত দীন ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জীবনের তেমন বহু মুহূর্তের একটী সুদীর্ঘ মুহূর্ত চিত্রায় কয়েকটি কবিতায় ধরা পড়িয়া আছে।

এ কথা আমি বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বজীবনের অনুভূতি ও সৃষ্টি-প্রেরণা একই বস্তু। আমার কথা হইতেছে এই যে, বিশ্ব-জীবনের অনুভূতিই তাঁহার সৃষ্টির মূলে প্রেরণা দান করিয়াছিল—এবং সৃষ্টির এই প্রেরণা তিনি যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি জীবনের এক এক স্তরে এক এক বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; একটি প্রবাহ একস্থানে আসিয়া বাধা পাইয়া, আর একদিকে স্রোতের গতি ফিরাইয়াছে, আর এক মুখে বাধা পাইয়া ভিন্ন মুখে গিয়াছে—কখনো শীতের শুষ্ক রেখায়, কখনো বর্ষার মত্ত ধারায়। আমার মনে হয়, সৃষ্টির এই প্রেরণা, এই creative impulse প্রথম হইতেই বিচিত্র গানে ও সুরে, গল্পে ও কবিতায়, ভাবে ও কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে এখনও করিতেছে—এবং এই সৃষ্টি-প্রেরণা বিশ্ব-জীবনের অনুভূতি দ্বারা উদ্বোধিত। অবান্তর হইলেও এখানেই এ কথা বলিতে চাই যে, এই অনুভূতিকেই কবি উত্তরকালে "জীবনদেবতা" বলিয়াছেন।

কবিগুরুর অনেক পত্রাংশে ও জীবনস্মৃতিতে বাল্যজীবনে এই অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট আভাস আমরা জানিতে পারি। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সদর-ষ্ট্রীটের রাস্তার পূর্ব্ব প্রান্তে ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে চাহিয়া যে অপূর্ব্ব অনুভূতির স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে; সে-কথা এখানে আর না-ই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আর একটি লেখাংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে এতো অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠ্‌তো! তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাঁখারী দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ীর ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক্, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্ত্তিতে আমায় সঙ্গদান করত।"

প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর আনন্দ বহু কবিই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আনন্দ একটা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রকৃতির সব কিছু রূপের সঙ্গে একটা 'নিগূঢ় আত্মীয়তা' অনুভব করিয়াছেন। এই বিশ্ব-প্রকৃতির যত কিছু রূপ, যত কিছু বিচিত্র প্রকাশ, সব কিছু যেন এক অখণ্ড রূপে তাঁহার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে; এবং সেই অখণ্ড রূপের সঙ্গে বাহিরের যত খণ্ড বিচিত্র রূপ সব কিছুর একটা নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ আছে। এই যে একটা অপূর্ব্ব রহস্যের অনুভূতি—বলা নাই, কহা নাই, এক একদিন হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে এই অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন একটা চঞ্চল পুলকে নাচিয়া উঠিত। অন্তরের সীমার

মধ্যে বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি যে একটা অনুভূতির স্পর্শদান করিয়াছে সেই অনুভূতিটাই আবার বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র রূপের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে চায়; সেই অনুভূতি যে কি বস্তু, কি যে তার স্বরূপ কিছুই স্পষ্ট বুঝা যাইতে ছনা, অথচ ভিতর হইতে কি যে একটা 'অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণী' ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এই যে অপূর্ব্ব রহস্য, মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক প্রকাশের মধ্যে বুঝি এই রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে; কিন্তু সত্য কথাটা এই যে সে অপূর্ব্ব রহস্য তাঁহার মনের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয়; সেইখানেই এই রহস্যানুভূতি 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' নিরন্তর তাহাকে সঙ্গদান করিতেছে। এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটির অনুভূতি বিশ্ব-জীবনের অখণ্ড অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রভাত-সঙ্গীতের অনেক কবিতায়, বিশেষ করিয়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ইঙ্গিত সর্ব্বপ্রথম একটা সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ লাভ করিল। যে অনুভূতির স্পর্শে সমস্ত দেহ-মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে অনুভূতি অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছে, সেই অনুভূতি একদিন সমস্ত অন্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির অপূর্ব্ব অসীম অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন দিয়া সার্থক হইতে চাহিল। যে বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশকে কবি নিগূঢ় আত্মবোধের বলে এক অখণ্ড রূপে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতিটিই আবার 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' তাঁহার ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে নিজকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি

* * *

পরাণ পূরে গেল হরষে হ'ল ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর। (প্রভাত সঙ্গীত)

সর্ব্বত্রই এই অনুভূতির ইঙ্গিতটুকু আমরা পাই। এই যে অনুভূতি ইহাকেই কবি উত্তরকালে "জীবনদেবতা" বলিয়াছেন, এই অনুভূতি চিরকাল "নানান্ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গদান" করিয়াছে। "প্রভাত-সঙ্গীত"-এ যখন দেখিতেছি তখনও এই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট,—তখনও তাহার একটা রূপ বা মূর্ত্তি কবির মনের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

এই অনুভূতির মধ্যে একটা তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত, বহু কথায় ও ও কবিতায় কবি তাহা প্রকাশ-ও করিয়াছেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের কোনো কোনো চিন্তাধারার মধ্যেও সে তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। বাহিরের এই যে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির সীমাহীন অগণন প্রকাশ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে, এই বিশ্ব-প্রকৃতি যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা একটা সীমার মধ্যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই অখণ্ড অনুভূতি কিছুতেই অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না—আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আপনি চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং আকুল আবেগে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির অসীমতার মধ্যে বিচিত্র রূপে নিজকে উপলব্ধি করিতে চায়। আসল কথা হইতেছে, যাহা অসীম তাহা কিছুতেই সত্য অথবা সার্থক নহে—তাহার কোনো রূপ নাই—সীমার মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার রূপ, তবে তাহার সার্থকতা;—এই সীমার মধ্যে ধরা না দিলে অসীমকে কিছুতেই

উপলব্ধি করা যায় না। আবার যাহা কিছু সীমার মধ্যে আবদ্ধ, যাহা কিছু সীমার মধ্যে একটা রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সেই সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অসীম অরূপের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন না দিল এবং উপলব্ধি করিতে না পারিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সার্থক হইল না। সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, অংশ ও সম্পূর্ণ এম্‌নি করিয়া পাশাপাশি বাস করে; আমাদের মরণশীল ব্যক্তিগত জীবন ও বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতির শাশ্বত জীবন—এ দুইয়ের মধ্যেও এমনি একটা 'নাড়ী চলাচলের যোগ' আছে। এই ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যেই আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির সীমাহীন শাশ্বত জীবনের সীমা প্রত্যক্ষ করি—সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা আমাদের অন্তরের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় না; তাহা না হইলে কি ব্যক্তিগত জীবন, কি বিশ্ব-জীবন কিছুরই কোন সার্থকতা থাকিত না।*

পরিণত বয়সের একটী কবিতায় এই তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে যোগ দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ আপনি ফিরে যেতে চায় সুরে।

---

* কবির কাব্যে জীবন-দেবতার যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে খুব সংক্ষেপে সে তত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড্ টম্‌সনের বহি'—সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ তত্ত্বের খুব সুন্দর একটু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার ব্যাখ্যার মূলগত কোনই পার্থক্য নাই; তবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একমত জানি বলিয়াই সে ব্যাখ্যাটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৪; পৃঃ ৫১৫-১৬)।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় স্বজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রথম যখন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়, তখন অন্তরের মধ্যে হঠাৎ একটা খুব আকুল চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে; স্পষ্ট একটা কিছু ধারণা হয় না, অথচ অনুভূতির তীব্রতা এত বেশী যে, নিজকে কিছুতেই ধরিয়া রাখাও যায় না। 'প্রভাত সঙ্গীতে' অন্তরের এই আকুল চঞ্চলতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এবং ক্রমে দেখিব, বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে কবি-চিত্তের নিগূঢ় আত্মীয়তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই এই অনুভূতি আরো তীব্র, আরো স্পষ্ট হইয়া সমস্ত কবি-জীবনকে অধিকার করিয়া বসিল। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' এই অনুভূতির যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত, 'ছবি ও গানের' দু' একটী কবিতায়ও তাহার আভাস আছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে এই অনুভূতি যেন একটা মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, যেন একটা রূপের মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে কবি একটা প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন।

শুনেছি আমারে ভাল লাগেনা
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর!

তুই ত আমার সঙ্গী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, 'প্রভাত সঙ্গীতে'র কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতি যেন ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, মনের মধ্যে বেশ একটা রূপ লইতেছে এবং সেই রূপের সঙ্গে যোগ একটু একটু করিয়া নিবিড় হইতেছে। এ যেন একটা প্রাণের মধ্যে একটা জীবনের মধ্যে আর একটা প্রাণ আর একটা জীবন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে; একটা চিরন্তন জীবন যেন একটা ক্ষণিক জীবনের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই ক্ষণিক জীবন যে দিকেই আঁখি মেলিয়া তাকায়, দেখিতে পায় কি শীতে কি বসন্তে, কি দিবসে কি নিশীথে, কি রোদনে কি হাসিতে, কি সম্মুখে কি পশ্চাতে, সর্ব্বত্র যেন এই চিরন্তন জীবনের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে, তাহারই আড়ালে সমস্ত ঢাকা পড়িয়াছে, সমস্ত জগৎ বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই 'অনন্তকালের সঙ্গীর' মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে! এই চিরন্তন জীবন এই অনন্তকালের সঙ্গী, বিশ্বজীবন যেন ইহারই মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে—

অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে তোর ছায়া
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবে কখন পাশেতে
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া

কখনও অন্তরের দেবতা, কখনও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গ দান করে। বাহিরে এই বিশ্ব বিচিত্র গান, বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে; কিন্তু সে সঙ্গীহারা বিরহী; একান্ত ব্যথায় সে কবির হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। কবির মনেও তখন বিরহ জাগিয়া উঠে; তখন তাঁহার মর্ম্মের মূর্ত্তিমতী কামনা অন্তঃপুরবাস ছাড়িয়া সলজ্জ চরণে আসিয়া বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গদান করে। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের এই ব্যাকুলিত মিলনের যে মুহূর্ত্ত এই মুহূর্ত্তটিই একটি আনন্দক্ষণের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশে'র মুহূর্ত্ত। এমনি মুহূর্ত্তেই যত গান, যত কবিতা মনের কুঁড়ির ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে উঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ। (মানসী)

'মানসী'র শেষ কবিতাটিও খুব লক্ষ্য করিবার। কবি মনে করিতেছেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে নিত্য যে তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে, তাঁহার উপর তিনি জয়ী হইয়াছেন; তিনি যে মাধুরী এ

জীবনে পাইয়াছেন সে তাহা পায় নাই। এই অলস সকাল বেলায়, অলস মেঘের মেলায় সারাদিনের জলের আলোর খেলার মধ্যে সর্ব্বত্র যেন সেই অন্তর-সঙ্গীর 'ওই মুখ ওই হাসি ওই দু'নয়নে' ভাসিয়া উঠিতেছে, কাছে দূরে সর্ব্বত্র মধুর কোমল স্বরে তাহার ডাক শুনা যাইতেছে। কবি তো তাই ভাবেন, এ জীবনে তিনি যাহা পাইলেন তাহার অন্তর-সঙ্গী তাহা পাইল না। কবি যে ভাবেন, তাঁহার নিজের কোনো সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু যাহার প্রসাদে তাঁহারই এই অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহাকেতিনি শুধাইয়াছেন,—

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারে-ও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভ'রে।
আমাতে ও স্থান পেত অবাধ, সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণ ধরিয়াছে
কত ভালবাসা। (মানসী)

কিন্তু সেই সীমাহীন ভালবাসায় ভরা 'পরাণ' কি দেখিতে তুমি পাইবে—হঠাৎ কোনো শুভ-মুহূর্ত্তে যে তাহার দেখা মেলে ?

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে
দেখিতে পাওনি যদি দেখিতে পাবেনা আর
মিছে মরি বকে'।

* * *

আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমরা তা' কই!' (মানসী)

কিন্তু 'সোণার তরী'তেই সর্ব্বপ্রথম এই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। 'মানসী'তে কবি যে 'মানসী-প্রতিমা' গড়িয়া তুলিয়াছেন, 'সোনার তরী'তে তাহাই 'মানস-সুন্দরী' হইয়া দেখা দিল। এই কবিতাটিই আমি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণার রহস্যময়ীকে যেন আমরা দেখিতে পাই। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, নড়াচড়া আন্দোলন, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র প্রকাশ, সব জড়াইয়া একটি 'অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী' তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গদান করিত—এই প্রাণীটির সঙ্গে তখন ভাল করিয়া পরিচয় ছিল না, তবু কি সন্ধ্যায় কি প্রভাতে, কি গৃহকোণে কি জনশূন্য গৃহছাদে, আকাশের তলে এই আধ-চেনাশোনা সঙ্গীটির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত, নানান্ বিচিত্র কথা বলিয়া সে তাঁহাকে ভুলাইত। বাল্যকালে এই সঙ্গীটি তাঁহার কাছে আসিয়াছিল নবীন বালিকামূর্ত্তি ধরিয়া—কবি জীবনের এই প্রথম প্রেয়সীকে, তাঁহার ভাগ্যগগনের সৌন্দর্য্যের শশীকে—তাঁহার যৌবনের মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথী বনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'তো দুই জনে
আধ চেনা শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে; ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে

নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যস্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথি পত্র, কেড়ে নিয়ে খ'ড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হ'তে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য ভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে,
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্যমিথ্যা তুমি জান তার। (সোণার তরী)

কিন্তু সে বাল্যজীবন কবির এখন আর নাই—তাঁহার বালিকা সঙ্গিনীও শৈশবের খেলাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কবির জীবনের বনে যৌবন-বসন্তের প্রথম মলয় বায়ু আজ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, মনের মধ্যে নূতন নূতন আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বজীবনের অনুভূতি আজ নূতন মোহে নূতন রূপে তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। এমন দিনে কবি হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার শৈশবের সঙ্গিনী

—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত। * *

* * * *

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছো মোর মর্ম্মের গৃহিণী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

বাল্যের সঙ্গিনী আজ অন্তরের প্রিয়ারূপে দেখা দিয়াছে—বাল্য যাহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল, আজিকার যৌবনও তাঁহারই মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—অনুভূতি একই রহিয়া গিয়াছে, শুধু তাহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তরের এই প্রিয়া সে তো অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, সে যে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে। হয় ত কবি-জীবনের এই প্রিয়া পূর্ব্বজন্মেও কবির অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া ছিল—মৃত্যু-বিরহে সে মিলন-বন্ধন টুটিয়া গিয়া প্রিয়া তাঁহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই কবি এই বিশ্বপ্রকৃতির যে দিকেই তাকাইতেছেন, প্রিয়ারই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা-রাতে
নির্জ্জন-গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধ শুভ্র বিরহ শয়ন!

(সোণার তরী)

কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রিয়ার এই অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়াই কবি যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না; বাস্তব মূর্ত্তিতে এই মানসী প্রিয়াকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন—তাহাকে তিনি তাই শুধাইতেছেন,

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি? (সোণার তরী)

এই সর্ব্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতি কোনো বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া কোনো দিনই দেখা দেয় নাই, কিন্তু কতরূপে যে এই অনুভূতির স্পর্শ কবি লাভ করিয়াছেন, কত ভাবে যে তাঁহার মানস-সুন্দরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন এই অন্তর-প্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার ঝুলনমেলা, সেদিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তিনি দেখিলেন, তাহার 'পরাণ' তাঁহার বুকের কাছে বসিয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া সে কবির বক্ষ চাপিয়া ধরিতেছে, এই নিষ্ঠুর নিবিড়-বন্ধনসুখে কবির হৃদয় নাচিতেছে, তাঁহার বুকের কাছে 'পরাণ' তাহার 'আকুলি ব্যাকুলি' করিতেছে। এতকাল তিনি ভয়ে ভয়ে এই পরাণসম মানসসুন্দরীকে যতনে পালন করিয়াছেন, পাছে তার ব্যথা লাগে, পাছে দুঃখ জাগে; সোহাগে তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছেন, যাহা কিছু মধুর সুন্দর তাহাই দু'হাত পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সুখ আজ তাঁহার প্রিয়াকে আলস্যরসের আবেশে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; স্পর্শ করিলে আজ আর সে

সাড়া দেয় না, কুসুমের হার তাহার গুরুভার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমন করিলে আমার মধুর বধূরে যে হারাইব, অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া যুঝিয়া যে মরিব? তাহাকে যে আজ আবার নূতন করিয়া পাইতে হইবে—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা
মরণ দোলায় ধরি রসি গাছি
বসিব দু'জনে বড় কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।
দে দোল দোল!
দে দোল দোল!
এ মহাসাগরে তুফান্ তোল্
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল্!

* * *

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল
দে দোল্ দোল্! (সোণার তরী)

আজ দেখিলাম অন্তরে এ কি কল্লোল, আকাশে বাতাসে কি অট্টরোল—মানস-সুন্দরীর সঙ্গে কি অপূর্ব্ব ঝুলনমেলা। কিন্তু আর একদিন দেখিতেছি এই মানস-সুন্দরীই তাঁহাকে কোন্ নিরুদ্দেশ-যাত্রায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, তার কোনো ঠিকানাই নাই—কিসের অন্বেষণে যে এই যাত্রা কবি নিজেই তাহা জানেন না; অথচ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তরলক্ষ্মী, সেই আজ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। পথের মধ্যে অন্তরের সুন্দরীকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোণার তরী ?
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে ?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে,
কি আছে হেথায় চলেছি কিসেব
অন্বেষণে ! (সোণার তরী)

আবার এ কথাও কবি জানেন, যত বিচিত্র হোক্ অন্তরের মধ্যে অনুভূতির এই প্রকাশ, বিশ্বপ্রকৃতির যত বিচিত্রতার মধ্যেই সে আপনাকে বিকশিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলুক, অন্তরের মধ্যে সকল বৈচিত্র্য এক হইয়া গিয়া একটী মাত্র অখণ্ড রূপ গ্রহণ করিয়াছে,

সেখানে তাহার বিচ্ছিন্ন পৃথক আর কিছুই নাই। এই একটীমাত্র অখণ্ড রূপ তাঁহার মানসী-সুন্দরীর রূপ, অন্তরতমের রূপ, জীবনদেবতার রূপ। জগতের মধ্যে এ রূপের প্রকাশ বিচিত্র—সুদূর নীলগগনে নীহারিকাপুঞ্জের অযুত আলোকে তার রূপ ঝলসিয়া উঠিতেছে, ফুলকাননে সে আকুল পুলকে উল্লাসে মাতিয়া উঠিতেছে, দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র সেই চঞ্চলগামিনী চিত্রা চলচঞ্চল চরণে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মুখর নূপুর সুদূর আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে; মধুর মন্দবাতাসে অলকগন্ধ উড়িয়া যায়, নৃত্যের তালে তালে মঙ্গল রাগিণী ঝঙ্কারিয়া উঠে। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এত বিচিত্র যাহার লীলা, সে কিনা কবির অন্তরের মধ্যে দেখা দিল তার সমস্ত বিচিত্র প্রকাশকে এক করিয়া অখণ্ড রূপ ধরিয়া—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী!

*   *   *

(কিন্তু)

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী!

দেখিলাম, বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড অনুভূতি মানস-সুন্দরীর রূপ ধরিয়া কবির অন্তরকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুন্দরীকেই বাহিরে তিনি বিশ্বজীবনের সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছেন, এই সুন্দরীই তাঁহার জীবনকে বিকশিত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পদে পদে তাঁহাকে দিক্ ভুলাইতেছে, অজানা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—কবির নিজের কোনো কথা নাই, ভাষা নাই, তাহারই কথা লইয়া ভাষা লইয়া তাঁহারই

মানসসুন্দরী জীবনদেবতা তাঁহার অন্তরের সকল কথা সকল ভাষা ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ কি অপূর্ব্ব রহস্য, এ কি অদ্ভুত কৌতুক—এর কি কোনো অর্থ আছে, কোনো শেষ আছে ?

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

শুধুই কি তাই ? শুধুই কি আমার কথা লইয়া সুর লইয়া গান লইয়া ভাষা লইয়া তোমার এই কৌতুক—আমার জীবন লইয়াও যে তোমার অর্থহীন কৌতুকলীলা রাত্রিদিন ;—আমি চলিতে চাহি এক পথে তুমি যে চলাও অন্য পথে, আমাকে যে তুমি তোমার খেলার পুতুল করিয়া গড়িয়া তুলিলে—

একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

(কিন্তু)

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক
কোথা যাবো আজ নাহি পাই ঠিক্‌
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে ! (চিত্রা)

কিন্তু এত করিয়া যে তুমি আমাকে নিজেই বরণ করিলে, আমার অন্তরের মধ্যে বাস করিয়া আমাকে লইয়াই এত যে কৌতুক করিলে, তোমার হাতের পুতুল করিয়া এত যে খেলাইলে, আমার সমগ্র জীবনকে যে তুমি তোমার পূজার ফুল বলিয়া গ্রহণ করিলে—এত

কিছু করিয়া আমাকে লইয়া তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ কি? এ প্রশ্ন তো না করিয়া উপায় নাই।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম? (চিত্রা)

আমাকে নিঃশেষে যদি তুমি লইয়া থাক, আমার যত শোভা যত গান যত প্রাণ সব যদি আজ শেষ হইয়া থাকে, আমার জীবনকুঞ্জে তোমার অভিসার-নিশা যদি ভোর হইয়া থাকে—তবে আমাকে আবার তুমি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লও, আমার মধ্যে আবার নূতন করিয়া তোমার অভিসার আরম্ভ হউক—তুমি তো নিজেই নিত্য নূতন, আমার অনিত্যের মধ্যে তোমার নিত্য লীলা নিত্য বিকশিত হউক—

ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আন নব রূপ আন নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে। (চিত্রা)

কিন্তু এ নব নব রূপের যে আর শেষ নাই, সীমা নাই—আর এই নব-নব-রূপ নব-নব-শোভার আবাহনেরও শেষ নাই। অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের স্পর্শ নূতন নূতন ভাবে একবার অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই না কবি-জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবন আজ গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে—'চৈতালী'তে কবি তাই তাঁহার 'নিকুঞ্জ নিবাসে' আবার অন্তরতমকে আবাহন করিয়াছেন।

'প্রভাত সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চৈতালী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-নাথের কবিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে অনুভূতি তাহার [illegible]শ ও পরিচয়টুকু আমরা লইতে চেষ্টা করিলাম। বহু কবিতার [illegible]হা

এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু যে কবিতাগুলিতে সেই আভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, সেই কবিতাগুলি হইতেই কবিজীবনের এই অপূর্ব্ব রহস্যটাকে বুঝিতে চেষ্টা করা সহজ। দেখিলাম, কবি-জীবনের প্রথম হইতেই বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে কবিহৃদয়ের একটা নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ—তাহার সঙ্গে কবির কি যেন একটা আত্মীয়তা আছে। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু তিনি চোখের ও মনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, কানে শুনিতেছেন, স্পর্শে অনুভব করিতেছেন, এই পাখীর গান, বাতাসের শব্দ, আকাশের সূর্য্যচন্দ্রতারা, মানুষের চলা বলা, গাছ পালা, নদ-নদী যত কিছু, সব মিলিয়া যেন একটা অখণ্ড রূপ লইয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধরা দিয়াছে—এই রূপ তাঁহার অর্দ্ধপরিচিত এবং এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটি যেন নিরন্তর তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' এই কামনাটা প্রকাশ পাইয়াছে। বলিয়াছি, অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাণীটি ইহার পরিচয় প্রথম স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ক্রমে যেন তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে দেখা গেল, বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশ যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ লইয়া কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কবি একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—সে তাঁহার খেলার সখী। কিন্তু এই বন্ধন নিবিড় হইতে যতই নিবিড়তর হইতে লাগিল এবং কবির বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার সখী কবির প্রাণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কবির প্রেমের কারাগারে বন্দী হইতে লাগিল এবং ক্রমে বাল্যের সখী কৈশোরের সঙ্গিনী যৌবনে অন্তরলক্ষ্মী হইয়া মর্ম্মের গৃহিণী

হইয়া অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার সঙ্গে কবির কত মিলন-বিরহের লীলা, কত সোহাগ-চুম্বন,—এ যেন প্রায় প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের দাম্পত্য-প্রেমের লীলা! এ লীলার মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে অবসাদ দেখা দেয়, প্রতিদিনের স্পর্শে মাধুর্য্য তাহার নূতনত্ব হারায়। তখন আবার নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে আবার তাহাকে একটী গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি আমাকে লইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, আমার কথিত ও অকথিত যত বাসনা, কৃত ও অকৃত যত কর্ম্ম সব কিছু তুমি গ্রহণ করিয়াছ কি? কিন্তু এই প্রিয়তমার রূপ ছাড়া এই মানসসুন্দরীরই আর একটা রহস্যরূপ আমরা দেখিতে পাই। সে রূপ শুধু প্রিয়তমারই রূপ নয়—সেখানে যেন এই প্রিয়তমাই আবার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে দেখা দিয়াছে; আগে যাহা বলিয়াছি এ যেন ব্যক্তি-জীবনের মাঝখানে আর একটা জীবন এবং সেই আর একটা জীবনই যেন ব্যক্তি-জীবনের অধীশ্বর। মানস সুন্দরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সে এক কৌতুকময়ীর রূপ রহস্যময়ীর রূপ—কবি নিজে যাহা বলেন তাহা এই রহস্যময়ীর কথা, যে পথে চলেন সে পথের নির্দ্দেশও করে এই কৌতুকময়ী, সে-ই তাঁহাকে অজানা নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যময়ী কৌতুকময়ী মানসসুন্দরীই জীবনদেবতা—বাল্যে যে সখী, যৌবনে যে প্রিয়তমা। সকলেই এই বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড রূপ। ইহার অনুভূতিই অন্তরপুরুষের অনুভূতি—জীবনদেবতার অনুভূতি! ইনিই কবিজীবনের অধীশ্বর—ইনিই কবির অসংখ্য কথায় ও কবিতায়, গানে ও সুরে নিজকে সার্থক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কবিজীবনের এই অধীশ্বরের, জীবনদেবতার অনুভূতি অত্যন্ত রস ও রহস্যময় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় অনুভূতি না হইয়াই পারে

না। কারণ, যাহাকে জীবনদেবতার অনুভূতি বলিতেছি তাহার মধ্যে বিশ্বজীবনের যত রূপ যত রস, যত বর্ণ যত গন্ধ, যত বিচিত্র প্রকাশ যত রহস্য যত সৌন্দর্য্য, সব কিছুর অনুভূতি এক হইয়া অন্তর ব্যাপিয়া একটি মাত্র অনুভূতির রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং সে প্রতি মুহূর্ত্তে বাহিরের বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া মরিতেছে। আর যে কবির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নাড়ী-চলাচলের যোগ এত সত্য, যিনি তুচ্ছতম পদার্থের মধ্যেও অপূর্ব্ব রস ও সৌন্দর্য্যের আস্বাদন লাভ করেন, আকাশের নীহারিকাপুঞ্জ, উপরকার ছায়ালোক, বাড়ীর বাগানের নারিকেল গাছ সব কিছুর মধ্যে যিনি অনির্ব্বচনীয় রস ও রহস্যের আভাস পাইতেন, তাঁহার কাছে এই জীবনদেবতার অনুভূতি যে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রস রহস্য ও সৌন্দর্য্যের উৎস হইয়া সমস্ত জীবনকে কবিতার কুসুমে কুসুমে ফুটাইয়া তুলিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। হইয়াছেও তাহাই। 'প্রভাত সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন গানে গানে কবিতায় কবিতায় একেবারে ছাইয়া গিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। আর সে গান ও কবিতা উভয়ই অপূর্ব্ব, কোনো তত্ত্ব নাই, কোনো কথা নাই, যেন একটি অফুরন্ত রস ও সৌন্দর্য্যের প্রবাহ; বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের সম্পূর্ণ মিলনের যে আনন্দ, সে আনন্দ যেন এই সময়কার কবিতাগুলির ভিতর হইতে আপনি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত জীবন যেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রসে ও সৌন্দর্য্যে, ভোগে ও প্রেমে একেবারে ডুবিয়া আছে—বিশ্বজীবনের অফুরন্ত রস উৎসের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মধ্যে নিজকে ভাল করিয়া ভোগ করিবার, সার্থক করিবার একটা চঞ্চল আকুলতা মনের মধ্যে আবেগে কম্পিত হইতেছে। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি,' 'স্বর্গ হইতে বিদায়',

'প্রবাসী' ইত্যাদি অনেক কবিতায় সেই আকুলতার আবেগকম্পন প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সত্যই অপূর্ব্ব রহস্যময়।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা' কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হ'য়েছি ভ্রমণে!

* * *

এ সাতমহলা ভবনে আমার
চির জন্মের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।" (সোণার তরী)

এ কথা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন ভাব বিকাশ সত্ত্বেও 'প্রভাত সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একান্তই রূপমাধুর্য্য রস-সৌন্দর্য্যানুভূতির জীবন। ইহার পরে 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' হইতে কবিজীবনের যে নূতন অধ্যায় সুরু হইল তাহার মুখে এই মাধুর্য্যরসপূর্ণ জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইল। এই বিদায়ের একটা বেদনা আছে, সে বেদনার ক্রন্দন 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জীবন-দেবতার অনুভূতি এখনও যেন অন্তরের মধ্যে তার স্পর্শ বুলাইয়া রাখিয়াছে। তবু উপায় নাই, এই মানসসুন্দরী প্রিয়তমার কাছ

হইতে বিদায় লইতেই হইবে—যত নিষ্ঠুর যত কঠোর হোক তাহা—

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি
আর নাহি দেরী ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠিছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ শয়নে
প্রভাতে উঠিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে—

কবি তাহা জানেন,তবু—

সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। (কল্পনা)

কবি তো বাঁধন ছিঁড়িতে চান; কিন্তু পিছন হইতে কে তাঁহাকে ডাকে;—তিনি তো মনে করিতেছেন, কাজ তাঁহার শেষ হইয়াছে, দীর্ঘ দিনমান কাটিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, এখন তাঁহার বিদায়ের সময়—কিন্তু এমন সময় অন্তরের মধ্যে কে ডাকিয়া উঠে, কার আহ্বান শুনা যায়—এ কি জীবনদেবতার?

'রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোরা স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী।
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ।

বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একলার স্থান
কোথা হ'তে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান? (কল্পনা)

যাহা হোক্, 'নৈবেদ্য' হইতে সুরু করিয়াই এই রসমাধুর্য্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ পূর্ণ হইল। বিশ্বজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই নাড়ী চলাচলের যোগ আর অনুভব করা যাইবে না, তুচ্ছতম ক্ষুদ্র বস্তুটিতেও সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার, ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ আনন্দ 'to see a world in a grain of sand' আর দেখা যাইবে না, সুখে-দুঃখে হাসি কান্নায় ভরা এই পৃথিবী তা'র নানান্ রূপে কবির প্রাণে আর দোলা দিবে না—বহুদিনের জন্য এই অনুভূতি স্তব্ধ হইয়া গেল! 'নৈবেদ্যে' যে জীবনের আরম্ভ, 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে' সেই জীবনের পূর্ণতা। এই জীবনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির নয়, ক্রমশঃ বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁহার অনুভূতিই সমস্ত অন্তরের মধ্যে মায়া-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। বিশ্বজীবনের সমস্ত বিকাশের মূলে যিনি তিনিই এই সময়ের কবিজীবনকে আর এক সার্থকতায় ভরিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ভাবধারার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন, কাজেই সবিস্তারে তাহা এখানে বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাবধারার এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদেবতার যে অপূর্ব্ব রসরহস্যময় অনুভূতি তাহারও অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইল। আর না হইয়া উপায়ই বা কি? বিশ্বজীবনের সঙ্গে গভীর নিগূঢ় আত্মীয়তা বোধ অপেক্ষাও গভীরতর রহস্যের মধ্যে মন যেখানে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেখানে জীবনদেবতার অনুভূতি তো কতকটা বিদায় লইতে বাধ্য; কারণ জীবনদেবতা রহস্যের সমস্ত অনুভূতিটুকু তো

প্রতিষ্ঠিতই ছিল বিশ্বজীবনের আবার নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের উপর, তাহার বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ড রূপে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার উপর।

এইখানে এই কথাটা বুঝা সহজ হইবে যে বিশ্বজীবনের অনুভূতি এবং বিশ্বদেবতার অনুভূতি এক নহে। হইতে পারে যে বিশ্বজীবনের অনুভূতিই ক্রমে বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, হয় তো বা দু'য়ের মধ্যে একটু সত্য সম্বন্ধও রহিয়াছে। সে যাহাই হোক্, এ কথা ঠিক্ যে এই দুই অনুভূতিকে আমরা এক বলিয়া কিছুতেই ভুল করিতে পারি না। জীবনদেবতার প্রকাশ বিশ্বজীবনের মধ্যে নয়, আমার মধ্যে অর্থাৎ আমি এই বিশেষ ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে—এইখানে তাহার লীলা এবং সেই লীলাকে আমি উপলব্ধি করি আমার অন্তরের বাহিরে বিশ্বজীবনের মধ্যে। 'আমি' এই ব্যক্তির ক্ষণিক জীবনকে জীবনদেবতার প্রসাদে উপলব্ধি করি বিশ্ব-প্রকৃতির চিরন্তন জীবনের মধ্যে ;—কারণ আমার সঙ্গে যে বিশ্বজীবনের নাড়ীর যোগ, 'আমরা যে একই ছন্দে বসানো,' সেই জন্যই তো বিশ্বজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও স্পন্দন অনুভব করি ; সেই জন্যই তো সমস্ত বিশ্ব-প্রাণের আনন্দকে আমি নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। এই হিসাবে জীবনদেবতা কবিজীবনেরই একটা বৃহত্তর গভীরতর জীবন। বিশ্বদেবতা বা ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি আর যাহাই হোক ঠিক ইহা নহে। তবে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, জীবনদেবতার অনুভূতি ক্রমে বিশ্বদেবতার বৃহত্তর গভীরতর অনুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল, ব্যক্তিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে উপলব্ধি তাহা বিশ্বজীবনে বিশ্ব-দেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কারণ, 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতির কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়,

কবিজীবনের মধ্যে যে বৃহত্তর র জীবনের অনুভূতি, সেই অনুভূতিই যেন কোথাও কোথাও বিশ্বদেবতার ভগবানের অনুভূতি বলিয়া মনে হইয়াছে—অবশ্য ক্ষণিক একটা মুহূর্ত্তে!

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের রহস্যকে যে ভাবে আমি এখানে উপস্থিত করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা তত্ত্ব আপনি প্রকাশ পাইয়াছে, একটা সত্য আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে;—এই সত্যের একটু আভাস আমি দিতে চেষ্টাও করিয়াছি। হয় ত রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার যে অপূর্ব্ব রহস্য তাহা এই সত্যকে কতকটা আশ্রয়ও করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটাকে কিছুতেই আমি একান্ত করিয়া দেখিতে চাই না—ইহার মধ্যে বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শন, অথবা উপনিষদের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা হেগেলীয় দর্শন কতখানি স্থান পাইয়াছে, কতখানি পায় নাই, সে বিচারের মধ্যেও ঢুকিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করিনা। এ রহস্য একান্তই অনুভূতির কথা—অনুভব দ্বারাই এ রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এ রহস্যের সঙ্গে যে অনুভূতি, যে কল্পনা জড়াইয়া আছে, তাহা একান্তই কবিচিত্তের একটা সহজ ভাববিলাস। আমি আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ কবি—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নহেন; তাঁহার কবিজীবনের উৎস কোনো নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব অথবা সত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নহে, সে উৎস তাঁহার কবিচিত্তের অতি সহজ এবং অতি আশ্চর্য্য অনুভূতির ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ক্ষমতার বলেই তিনি জগৎ ও জীবনের যত দুর্গম ও দুজ্ঞেয় রহস্যের মণিকোঠার সন্ধান পাইয়াছেন—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। সেই জন্যই এই জীবনদেবতার রহস্যের মধ্যে কোনো তত্ত্বের সন্ধান লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না—কবিকে কিংবা কবির কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে সে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের কিছু সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রসঙ্গের সূত্রটিকে আবার ধরিতে চাই। 'কল্পনা-ক্ষণিকা'র সঙ্গে সঙ্গেই কি কবির অন্তরের মধ্যে তাঁহার জীবনদেবতার, মানসসুন্দরীর এই রহস্যময় অনুভূতিটি স্তব্ধ হইয়া গেল—আর কি তাহা কবিচিত্তকে রস ও সৌন্দর্য্যের গন্ধে বর্ণে পুষ্পে পত্রে ভরিয়া দিবে না? আপাত-দৃষ্টিতে কিন্তু তাহাই মনে হয়,—মনে হয়, সত্য সত্যই বুঝি কবি এই অনুভূতিটিকে হারাইলেন। যে মানসী প্রিয়া একবার অন্তরতম হইয়া অন্তরবেদীটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কি সত্যই চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবেন, আর কি কোনো দিনই তাঁহার দেখা মিলিবে না? বিশ্বদেবতাই কি জীবনদেবতার আসন জুড়িয়া থাকিবেন?

এ কথা সকলেই জানেন যে, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালীর' কবি রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় এক নূতন জীবনে জন্মলাভ করিয়াছেন—এই নব জন্মলাভ বাস্তবিকই একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এক সময় ভাবিয়াছিলাম, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে'র রসবোধে সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ বিশ্বদেবতার চরণে আত্মসমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানবচিত্তের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, কি করিয়া 'বলাকা'য় এই নবজন্মলাভ সম্ভব হইল, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। 'বলাকা' চঞ্চল গতিবেগের কাব্য—প্রেম যৌবন ও সৌন্দর্য্যের জয়গান খুব উঁচুদরের একটা intellectual appeal লইয়া সেই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের এই গতিবেগ, প্রেমাবেগ, সৌন্দর্য্যাবেগ ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা আবার সেই জীবনদেবতার রহস্যের সুস্পষ্ট আভাস একটু ফিরিয়া পাইতেছি।

'মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে, ঐ যে আমার নেয়ে', এই কবিতাটির মধ্যে বোধ হয় এই অপরিচিত অন্তরপুরুষটির অতি অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, 'বলাকা'র পরেই আসিয়াছে 'পলাতকা'। 'পলাতকা'য় দেখিতেছি বিশ্বজীবনের একটি অংশ মানবজীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখ, তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে সুরু করিয়াছে। মনে হয়, 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতে শুধু নানান ভাবে নানান ছলে গল্পকথায় মানবচিত্তের নানান্ অনুভূতির ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র মাধুর্য্য-রসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি বাল্যের সখী, কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনের মানসসুন্দরী যে অনুভূতির রূপে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল সে রহস্য সে অনুভূতি বুঝি ধীর পদসঞ্চারে অন্তর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বুঝি আসে, আসে, আসে!

'পূরবী'তে সে সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল—বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। কি করিয়াই বা পারিবে—বিশ্বজীবন যে বিশ্বদেবতার চাইতে প্রিয়তর, রবীন্দ্রনাথ যে মানবজীবনের কবি, প্রকৃতিজীবনের কবি! 'পূরবী'র ভাব রহস্য আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহার একটু পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে কারণেই হোক, যে গভীর অধ্যাত্মানুভূতির ভিতর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ডুব মারিয়াছিল সে জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না; কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায় তিনি ফিরিয়া আসিলেন, পুণ্য ধরার ধুলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে আবার নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই যা দেখা এই যা ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে।
পুণ্য ধরার ধুলোমাটী ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে। (পূরবী)

এই ইচ্ছা যখন জাগিল তখন কবি সহজেই অনুভব করিলেন—

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে,
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছ বিশ্বজনের প্রাণ! (পূরবী)

এ যেন আবার সেই প্রথম যৌবনের অনুভূতি, বিশ্বজনের প্রাণকে নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিবার আকুতি! আর এ আকুতি এ অনুভূতিই যদি ফিরিয়া আসিল তবে সেই লীলাসঙ্গিনী মানসসুন্দরীর স্পর্শ লাভের আর দেরী কত? সত্যই তো সেও ফিরিয়া আসিল—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'লো যেন চিনি
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলা সঙ্গিনী? (পূরবী)

এই লীলাসঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে—তার কঙ্কন-ঝঙ্কারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তার ইসারা ভাসিয়া আসিয়াছে, কখনও আমের নবমুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, কত বিচিত্ররূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে বারেবারে ভুলাইয়াছে, কিঙ্কিনী বাজাইয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে

জীবনসন্ধ্যায় সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি—পারিলেই আর কতদিন!

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়
সারা হ'য়ে এলো দিন
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।

এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশী
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নি:শ্বাসি
গানহারা উদাসীন।

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হ'য়ে এল দিন! (পূরবা)

এই যে মানসী প্রিয়ার অনুভূতিকে ফিরিয়া পাওয়া—এই কথাটি 'পূরবী'র অনেক কবিতাতেই খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও অনুভূতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মতন সেদিনের আমার প্রিয়তমার ত্রস্ত আঁখিযুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল, দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই। হে আকাশ, আজ তোমার ও নীল যবনিকা তুমি তুলিয়া দাও, আমার মানসী প্রিয়াকে খুঁজিয়া লইতে দাও। একদিন আমার অন্তর ব্যাপিয়া তার রাজ্যপাট বিস্তৃত ছিল, আর একদিন এক গোধূলি বেলায় সে তার ভীরু দীপশিখাটি

লইয়া কোথায় কোন্ দিগন্তে যে মিলাইয়া গেল, কিছুই জানিনা। আজ আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্ন অশ্রু সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। (পূরবী)

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী মঞ্জরী থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত কপোতকূজনমুখর মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া, কত রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত বিস্মৃতির জাল বুনিয়া দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁর প্রিয়াকে ভুলিয়াই থাকেন—আজ তার জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। কিন্তু এ কথা তিনি জানেন সেই প্রিয়ার স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন সোনা হইয়া গিয়াছে।

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসলে মোর এ জীবন উঠেছিল ফলে
আজো নাই শেষ; * * * *
* * * * * * *
* * * তোমার পরশ নাহি আর
কিন্তু কি পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার
বিশ্বের অমৃত ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। (পূরবী)

কিন্তু আরো উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? কবি নিজেই স্বীকার করিলেন, এই মানসসুন্দরীর অন্তরপ্রিয়ার স্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই—গানের ফসলে এ জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজো তার শেষ নাই। সত্যই 'আজো নাই শেষ।' দিন শেষের সায়াহ্নের গোধূলি-আলোকে সেই অন্তরতম আবার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, আবার অন্তরের মধ্যে জীবন-দেবতার রাজ্যপাট বিস্তৃত হইয়াছে, সেইজন্যই তো সত্তর বৎসর বয়সেও গানের ফসলের আর শেষ নাই—অফুরন্ত গান, অফুরন্ত কবিতা, অফুরন্ত রস, অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ধারাস্রোতের মতন নিরন্তর আমাদের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে—সেই ধারাস্রোত হইতে ঘট ভরিয়া কলসী ভরিয়া সৌন্দর্য্যসুধা আমরা ঘরে লইয়া যাইতেছি। বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবন যে নূতন করিয়া জীবনদেবতার অনুভূতি লাভ করিল ইহার জন্য কি কোনো প্রমাণের আবশ্যক আছে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঋতুর পর ঋতুতে কি আমরা দেখিতেছি না অফুরন্ত গানের, অফুরন্ত কবিতার ফোয়ারা—আর সে গান সে কবিতাই বা কি—সে ফুলে সে ফসলে বিশ্বদেবতার অভিনন্দন নয়, বিশ্বজীবনের অভিনন্দন।

আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতারহস্যের পরিচয় সেইভাবে আমি উপস্থিত করিলাম। আমার এ পরিচয় সত্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু যে কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই সেই কথাটি বলিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

'রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন যে ভাবধারার মধ্যে নানা বর্ণে নানা গন্ধে বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে ভাবধারার উৎস বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব রসরহস্যময় অনুভূতি; এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বাল্য কৈশোর ও যৌবনকে নানান রঙে রঙাইয়াছে, জীবনের সায়াহ্ন বেলাকেও এই অনুভূতিই বিচিত্র গোধূলিরঙে রাঙাইতেছে।'

বলাকার যুগ

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

আনাতোল ফ্রান্স ফরাসী লেখক ব্যালজাকের প্রতিভার সমালোচনা প্রসঙ্গে একটী ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এবং আমার মনে হয় ঐ তুচ্ছ বিবরণের ভিতর দিয়ে ফ্রান্স সাহিত্যসম্পর্কে যে উচ্চাঙ্গের সত্য আবিষ্কার করেছেন তার তুলনা হয় না। ফ্রান্স একদিন পুরোণো বইয়ের দোকানে একটী লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেন, যাঁর পোষাকের বৈচিত্র্য সর্ব্বপ্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অখ্যাতনামা ভদ্রসন্তানটী দেহের আর সকল অংশের পোষাকের পারিপাট্যে গভীর উদাসীন, কিন্তু মাথার টুপিটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে ও মনোরম ভাবে পরিধান করেছিলেন। ফ্রান্সের এই অপূর্ব্ব লোকটিকে দেখে প্রথমেই মনে হয় যে, ইনি মস্তিষ্ক-জীবি। কোনো ভূমিকা না করেই এই মহাশয় ব্যক্তি উত্তেজিত ভাবে ফ্রান্সকে অনেক কথা বল্‌তে লাগলেন, তার মধ্যে মোদ্দাকথা এই যে, ব্যালজাক্ নামক ফরাসী লেখক তাকে পাগল গৃহ-ছাড়া করেছে, দিবানিশি এই লেখকের স্বষ্ট চরিত্রগুলো তার চিন্তা ও কার্য্যকে অধিকার ক'রে রাখে, তার মনে শান্তি নেই, কেননা, the most diabolical of all, the Lucifer of Literature is Balzac. He has imagined a whole infernal world, which we are realising to-day. It is in accordance with his schemes that we are jealous, greedy, violent or abusive এবং ইত্যাদি। অবশেষে ফ্রান্সের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি একজন শিল্পী, কবি ও ঔপন্যাসিক;

ব্যালজাক্ তাঁর মনের সকল গ্রন্থি, সকল চিন্তার বাঁধন ছিন্ন ক'রে তাঁকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে ; Balzac is the prince of evil। গভীর নৈরাশ্যের সঙ্গে ফ্রান্সের এই অখ্যাতনামা সঙ্গীটী বারবার বল্‌তে লাগলেন,—"All poets and novelists trouble the peace of the earth"—পৃথিবীর শান্তি কবি ও ঔপন্যাসিকের দ্বারাই বার বার বিচলিত হ'য়ে ওঠে।

কাব্য ও কবির এমন অপূর্ব্ব সংজ্ঞা আর কখনও চোখে পড়েনি ব'লে বহুদিন আমার এই লাইনটী মনে ছিল। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো রচনা পড়্‌লেই আমার বার বার মনে হ'য়েছে, আনাতোল ফ্রান্স কবি-কুলের যে মনোরম সংজ্ঞাটী একদা পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা সকল শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ কবিদের পক্ষে যোলো আনাই খাটে, এবং সত্যিকার কবিত্বের এর চাইতে ভাল কোনো সরস পরিচয় দেওয়া যেতে পারে না। কবিতাকে অনেকে ব্যাধির সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন উপহাসের ছলে—কিন্তু কাব্যানুভূতি সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যাধির মতই যে অস্বাভাবিক, এতে আমরা সন্দেহ করি না, কেননা, ব্যাধি যেমন স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র, কবিতা লেখাও তেমনি একটা অঘটন এবং অধিকাংশের জীবনে একটা দুর্ঘটনা। কবি এবং রসস্রষ্টা উভয়েই সমস্ত সংসারকে দেখেন অসাধারণ দৃষ্টিতে, তাঁদের চোখে থাকে দূরান্তের দৃষ্টি, তাই তাঁরা যা বলেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের আটপৌরে চিন্তার যোগ থাকে অতি অল্প, এবং সেইজন্যই আমাদের এই পৃথিবীতে বার বার কবি ও ঔপন্যাসিকের কথার অর্থ অন্বেষণ ক'রে বহু লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে, বহু মানুষের চিন্তার স্থৈর্য্য নষ্ট হ'য়ে আলোড়নসৃষ্টি হয়েছে এবং বহু লেখক রবীন্দ্র পরিষদে প্রবন্ধ পাঠ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন। আমরা অনেকে বলি, কবি ও রসিকের মানস-জাত যে সৃষ্টি, তার জন্যে

দুশ্চিন্তার পরিমাপে মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ওজন হয়, এবং যে-কালে যে-জাতি যতখানি এই দুশ্চিন্তা বহন করেন, সে-জাতি সেকালে সভ্যতা ও উৎকর্ষের দিক থেকে ঠিক ততখানি সম্মান ও শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রে থাকেন। এই জন্যই আমাদের দেশে একদল লোক আমাদের এই কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যে, আজকার-বাংলা যে-কোনো একখানা মাসিক পত্রে রবীন্দ্র ঠাকুরের একটী কবিতা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে, এ স্বাস্থ্যেরই চিহ্ন, বাঙালীর মস্তিষ্কের উৎকর্ষেরই নিদর্শন। যে জাতি অপ্রয়োজনে যতখানি বেশী ব্যস্ততা দেখায়, সে-জাতি ততখানিই বেশী উন্নত ও অগ্রসর। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন কালেও মানব সভ্যতার এই একটী মাত্র মাপকাঠিই ছিল, এবং আজকার যুগে সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতির যতই বিকৃতি ঘটুক না কেন, সভ্যতার সারবত্তা ওজন করার মানদণ্ডটী ঠিক তেমনি রয়েছে। এই অপ্রয়োজনের দুঃখভারটী বহন করার গৌরব যেমন বাঙালী প্রতিভার অপরিহার্য্য অঙ্গ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্জ্জয় অনিবার্য্যতাও তেমনি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি ক'রে গেলেন, আমাদের মনের স্থৈর্য্য ও শান্তি পরিপূর্ণভাবে হরণ ক'রে নিলেন; কেননা, আসল কবি-ধর্ম্মী এবং শ্রেষ্ঠ রস-স্রষ্টার মতই পৃথিবীর প্রশান্ত নিশ্চলতাকে উত্তাল ক'রে তোলাই হয়েছে তাঁর কাব্যের বিশেষ রূপটি। এই হিসাবে আবার কবির কৃতিত্ব জগৎ-রচয়িতা বিধাতা পুরুষের মতই অপরিসীম ও অন্তহীন। বিধাতা যেমন জগৎ-সৃষ্টিকে অনায়াসে আটকিয়ে রাখতে পারতেন, এবং হিংসা-কলহময় পৃথিবীর দায়িত্ব হ'তে নিজেকে দিতেন মুক্তি, কবিও হয়ত তেমনি তাঁর সৃষ্টির আবেগ সম্বরণ ক'রে নিষ্ক্রিয় হ'তে পারতেন। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারেও যেমন

সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়ই সবখানি ছিলনা, কাব্য-রচনার বেলায়ও তাই। কবিতা রচিত বা লিখিত হয় না, সত্যিকার কবিতা যাকে বলে তা সংঘটিত হয়। কাব্য এমন একটী ঘটনা যার অঘটন ঘটানো কেবল অসম্ভব নয়, অসাধ্যও বটে।

রবীন্দ্রনাথও তেমনি একটী ঘটনা। আমাদের দৈনন্দিন জগতে এমন ঘটনা অহরহই ঘটেনা, এবং অহরহ ঘটেনা ব'লেই বোধ হয় এটী একটী ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা ও-দক্ষতা কেউই আয়ত্ত করতে পারে না, বোধ হয় এই জন্য যে ও ক্ষমতা বোধ হয় রবীন্দ্র-নাথেরও নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ও কবিতায় বার বার এই অদৃষ্ট প্রেরণার কথা ব'লেছেন, এবং এই অপ্রত্যক্ষ গুঞ্জরণ-ধ্বনিই যে তাঁকে কত ছলে কত দূরে নিয়ে গিয়েছে, তা কবি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক্ হ'য়ে ভেবেছেন। এই প্রেরণাই সাহিত্যসৃষ্টির মূল কথা, রসসৃষ্টির সম্পর্কে চরম বিচার। আমরা যতই না কেন কবির অন্তরের কথা বাহিরে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করি, কখনই এ-চেষ্টা সফল হবেনা। কারণ, কাব্য কেবল কবির অন্তরের কথা নয়, অন্তরতমের আদেশ। কাজেই তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় পাবে কোথায়? কিন্তু তবুও কাব্যের বিচার সকল দেশেই প্রশস্ত, তবুও কবির মনের সকল দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে সকল প্রকোষ্ঠগুলিকে নিরীক্ষণ করার এত আগ্রহ মানুষের! কেন না, আমরা আগেই ব'লেছি, এই অহেতুক কার্য্যতৎপরতাই সভ্যতার একটী বড় চিহ্ন, এই অবিশ্রাম আলাপ আলোচনা প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধ পাঠ সংস্কৃতির একটী শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথেরও সমালোচনা মার্জ্জনীয়, এই জন্যই যখনই কেউ রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো একটী বিশেষ দিকের এতটুকু আলোচনাও করেন তখন আমরা তাঁকে প্রশংসা করি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমগ্র রূপটী কেউ কোনো দিন পৃথিবীর সম্মুখে ধরতে

পারবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ যখন থেকেই যাচ্ছে, তখন এই অগাধ সমুদ্রের এক একটি বিশেষ রূপের সঙ্গে যদি কেউ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তাকে প্রথমেই আমরা দুঃসাহসী বলবনা, এবং এই চেষ্টাকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে তুলনা করবনা। কেননা, ভাল-মন্দ কোনো বিচার বিশ্লেষণই রবীন্দ্র-প্রতিভার গভীরতা ও বিশালতাকে ছোট করতে পারে না। তাঁর অন্তরলোকে যে উর্দ্ধশিখ দীপ প্রজ্জ্বলিত, তাকে ম্লান করতে পারে, তার শিখাকে নিম্নাভিমুখী করতে পারে এমন সমালোচনা হয় না। কেননা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সৃষ্টির মূলে কোনো প্রয়োজন ও ফরমায়েসের অবকাশ ছিল না, এর তাগিদ এসেছে তাঁরই নিজের মধ্যে থেকে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিতেরই অনুবর্ত্তন ক'রেছেন, অন্তরের এই মর্ম্মরধ্বনিকে ভাষায়, গানে ও ছন্দে অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছেন। কাজেই তাঁর কাব্যের, তাঁর প্রতিভার যে বিশেষত্বটীকে নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, তাঁর প্রতিভার অখণ্ড ও অমৃত রূপটীকে আমরা পাব না, তাঁর সঙ্গীতের অক্ষয় গীতিধ্বনিটীকে বেসুরো করার বা ক্ষুণ্ণ করার যথার্থ ক্ষমতা আমাদের হবে না।

প্রথমেই এত কথা বলবার প্রয়োজন এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের যে বিশেষ অধ্যায়টীর আলোচনা আমি এখানে আরম্ভ করতে চাই তার উদ্দেশ্য প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানে আজ যে-সুরটী নানা বিচিত্র ছন্দে ও লীলায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে সুর আনন্দের না বেদনার, হতাশার না উল্লাসের সমালোচকের বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমরা তা এখানে নির্ণয় করতে চাই এবং সেইজন্যই ভূমিকায় বার বার ব'লে নিতে চেয়েছি, সমালোচনার মাপ-কাঠিতে যতই সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি না কেন, যতই কেন একে আনন্দ বা বেদনা এমন একটা কিছু শব্দের মধ্যে বন্দী করতে চাই, কিছুতেই সব কথাটী ও শেষ কথাটী এসম্বন্ধে বলা হবে না;

কেনন, হয়ত এ সুর আনন্দ ও বেদনা উভয়ের মিলিত সুর এবং হতাশা ও উল্লাস দুইয়ের মিশ্রণেই হয়ত এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। কবি যদিও একথা ব'লেছেন যে, পূরবীর ছন্দেই শেষ রাগিণীর বীণ সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তবুও একটী মাত্র সুরই এই বীণায় বাজেনি চিরদিন, একটী মাত্র রেশই এই সঙ্গীত থেকে ধ্বনিত হয়নি। ভূলোক ও দ্যুলোকের যে রসময় ও আনন্দময় সত্তা, তার প্রকাশ একটী বাঁধা-ধরা বিশেষ রূপের ভিতর দিয়েই হয়নি, এর বস্তুময় অস্তিত্ব সত্য হ'য়ে উঠেছে বহু ও বিবিধ মূর্ত্তিতে, বিচিত্র লীলায় ও বিলাসে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ রাগিণীর বীণ কেবল একটী মাত্র সুরেরই ভাষা দেয় নি, একটী মাত্র কাহিনীই এর কথা নয়।

তবুও এই বিশেষ যুগটীতে রবীন্দ্র সাহিত্যে যে সুরটী প্রবল হ'যে উঠেছে. যে-গতি বার বার গানে ও কবিতায় সচল হ'য়ে উঠ্ছে, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে না হোক সমগ্ররূপে না হোক্, একটী বিশেষভাবে রূপায়িত আমরা দেখ্তে পাই এবং তা' থেকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যটীকে উপলব্ধি করতে পারি ও বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এই নূতন আকৃতিটী উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে 'বলাকায়'। 'মানসী' 'সোনার তরীর' যুগ ও 'বলাকার' যুগে সময়ের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বছর। 'গীতালি' পর্য্যন্ত যে strainটী কবিতায় পরিস্ফুট ছিল, বলাকায় তার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই চোখে পড়ে। অবশ্য এ-পরিবর্ত্তন আকস্মিক নয়। 'গীতালি'তেই কবি এই 'নব-প্রভাতের তীরে' পাড়ি দেওয়ার আয়োজনের কথা তু'লেছেন! উদয়াচলের সেই তীর্থপথে নূতন যাত্রা তাঁর সুরু হল, কেন না কবি নবতর সত্য, নূতন সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করছেন, তাই গীতালিতে তিনি বল্ছেন,—

"অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার
চিত্তাকাশে—" —যাত্রাশেষ

কবি এতদিন অন্ধকারের রহস্য-ভেদ করার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেননি, অসংখ্য আনন্দ ও বন্ধনময় পৃথিবী,—রূপ, রস ও গন্ধ তাঁর কাব্যকে সূর্য্যালোকের মত দীপ্ত ও স্বচ্ছ ক'রে তুলেছিল। এই ধরণীর লোকোত্তর অনুভূতি-অগ্রাহ্য সত্তার জন্য তাঁর মনে বেদনা জাগেনি, অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যময় পৃথিবী অশেষ আনন্দের আকর, তাইত পৃথিবীর সকল ছোটোখাটো সুখদুঃখও তাঁর কাছে এত অপরূপ এবং তাইত তাঁর গান সেইখানে তাঁর স্থান খুজে নিল,

যেথায় সুখে তরুণ যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।
পাখী যেথায় শোনায় গীতি নদী শোনায় গাথা,
কতরকম ছন্দ শোনায় পুষ্পলতা পাতা।
(যথাস্থান—ক্ষণিকা)

এবং সেইজন্যই হৃদয়ের অতি কাছে, হাতের মুঠোর মধ্যে যে বস্তুকে যে সত্যকে পাওয়া গেল তাকে ত্যাগ ক'রে গভীর চিন্তা দিয়ে দুঃখের জাল বুন্‌তে কবি রাজী হ'লেন না, এবং সরাসরি এই বিধান দিলেন,

নিজের ছায়া মস্ত ক'রে অস্তাচলে ব'সে ব'সে
আঁধার করে তোল যদি জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ ক'রে নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,—
দোহাই তবে এ কার্য্যটা যতশীঘ্র পারো সারো।
(বোঝাপড়া—ক্ষণিকা)

এবং এ কার্য্যের অন্তে আবার নূতন প্রভাতের আবাহন, নূতন সূর্য্যালোক, এবং

তাহার পরে আঁধার ঘরে প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল,
ভু'লে যা ভাই, কাহার সঙ্গে কতটুকু তফাৎ হ'ল।

কারণ কোনো বস্তুরই সূক্ষ্ম বিচারে কবির মন নেই, কোনো উদ্দেশ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর এখন কাজ নেই, ভালো মন্দ সকলকেই তিনি সহজে নিতে চান,

মুখের মধ্যে যেটুকু পাই যে হাসি আর যে-কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই তাই নেরে মন, তাই নে।

(অচেনা—ক্ষণিকা)

কেননা, কবির মন আজ গানে আনন্দে ঝঙ্কৃত, রসে নিমজ্জিত, দর্শনের দৃষ্টি দিয়ে, সমালোচকের ঠুলি প'রে কোনো কিছুরই বিচার করতে তিনি চাননা; সত্যের সহজ সরল যে মূর্ত্তি তাই তাঁর কাছে প্রচুর, এর বেশী তাঁর প্রয়োজন নেই, আর সকল তত্ত্ব-বচন গ্রহণ করায় তিনি অপটু, সেইজন্যই কাব্যলক্ষ্মীর কাছে এই প্রার্থনাই হ'ল তাঁর বিশেষ প্রার্থনা। তাই তিনি 'অপটু' কবিতায় বল্‌লেন,

নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়,
এমন কোন কর্ম্ম দেহ
অকর্ম্মণ্য দাসে। (ক্ষণিকা)

কিন্তু কবির মনের চটুল আনন্দে ভাঙন ধরেছে, 'বলাকা'র আগেই। 'গীতালি'তে যে সুরের পূর্ব্বাভাষ পেলাম, 'খেয়া'তে তার আগমনী শুন্‌তে পাই। কবির মনে অন্ধকারের জন্য দুঃখ ঘনিয়ে উঠ্‌ছে তাই 'খেয়া'র সুর এত বিষন্ন ও করুণ। 'বিধির সঙ্গে বিবাদ করার' জন্য কবি আয়োজন আরম্ভ করেছেন, বিধির বিধানকে

উচ্ছল আনন্দে সচল ও অনির্ব্বচনীয় ক'রে তুল্‌তে তিনি যেন আর চাননা। তাঁর মনের অন্দর বাহির বেদনার ভারে মূর্চ্ছিত। পৃথিবীর সকল অশ্রু যেন সেখানে এ'সে জমাই হচ্ছে। 'ক্ষণিকা'য় আনন্দের যে কলোচ্ছ্বাস, যে প্রাবল্য, তার ক্ষীণ চিহ্নটুকুও 'খেয়া'য় নেই, যখন কবি লিখ্‌লেন,—

ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে। (খেয়া)

এইখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার নব বিকাশের transition-যুগ, এইখানেই নূতন আলোকের জন্য নবতর ব্যাকুলতা কবির অন্তরে। একদা প্রভাতালোকে যে সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল, সেই নির্ঝরের নয়নে আজ বেদনার অঞ্জন, বুকে ব্যাথার পাষাণ। সে উচ্ছ্বাস নেই, সে গতি নেই, কবির মনে আজ প্রশান্ত বেদনার নিবিড়তা। সেইজন্যই ঘাটের কিনারায় ব'সে নূতন সম্ভাবনার বেদনায় তাঁর আঁখি সজল হয়ে উঠ্‌ছে, তাঁর কণ্ঠে বেদনার বাণীই উচ্চারিত হচ্ছে ;—

ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফল্‌লোনা,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো সব ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বল্‌লোনা,
সেই ব'সেছে ঘাটের কিনারায়। (খেয়া)

আলোর জন্য যে ব্যাকুলতা, সত্যের জন্য যে আগ্রহ এখানে বেদনায় ধ্বনিত হল, তা'ই ক্রমশঃ নূতন আকার নিয়ে জন্মলাভ করল 'বলাকা'য়। 'বলাকা'য় এই বেদনার গ্লানি কেটে গেছে, মলিনতা মুছে গেছে এবং গাম্ভীর্য্য সুপ্রচুর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু 'ক্ষণিকা'র সেই কল-গীতি নেই, সোনার 'তরীর' সেই মায়া মুছে গেছে, 'চিত্রা'র

নিবিড় কামনা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। 'ক্ষণিকা'র কবি একদা অপ্রয়োজনে ও অকারণে গাঁয়ের পথে চ'লেছিলেন; চলার কথাই ছিল তখন শেষ কথা,—

ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে নিজ মনে;
আমি কোথায় চ'লেছিলেম অকারণে (পথে—ক্ষণিকা)

কিন্তু এই অকারণ গতির পথ নিদারুণ দুঃখের অন্ধকারে ক্রমশঃ বেদনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভাল মন্দ সকলকেই সহজে গ্রহণ করার শক্তি—অন্তরতলে অনুসন্ধান ক'রেও যেন কবি নাগাল পাননা। মানুষের দুঃখ দৈন্যের আর্ত্তনাদে কবির মন উতলা হ'য়েছে; তাঁর মনে আজ বারবার 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে কত বিলম্ব' এই প্রশ্নই ধ্বনিত। জীবন দেবতার যে সঙ্কেত একদিন উদ্দেশ্যহীন অবিরাম গতিকেই কবির জীবনে সত্য ক'রে তুলেছিল, যারই উদ্দেশে শান্তি-স্বর্গের অনুসন্ধানে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার ঘরে তাঁর যাত্রা, সে গতি আজ সহসা রুদ্ধ। যে মহাশঙ্খ তুলে ধরার ক্ষীণ বাসনা কবির মনকে সেই কতকাল ধ'রে আলোড়িত ক'রেছে, তা'ই আজ প্রখর হ'য়ে উঠল। পথের পাশে অবনত মহাশঙ্খ ধূলিধূসরিত, তাই তাঁর চঞ্চল গতি নিস্তব্ধ, উর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্র কবির বিষণ্ণ দৃষ্টি বিস্তারিত ও প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক নূতন সর্গের প্রারম্ভ সূচিত হ'ল এখানে। এরপর থেকে কবির সমস্ত কাব্যাভিজ্ঞান নূতন রঙে রঞ্জিত হ'য়ে উঠল, তাঁর সমগ্র জীবন একটী নবীন নাবিকের আগমনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠল; যে নাবিক

সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌ছে তরী বেয়ে,

অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে। (পাড়ি—বলাকা)

'মত্তসাগর পাড়ি দিয়ে' একদা গহন রাত্রিকালে কালো রাতের কালিঢালা ভয়ের বিষম বিষকে একটী রজনীগন্ধার গুচ্ছে রূপায়িত ক'রে এই নাবিক যে কবির কল্পনা ও চিন্তাতরণীর কর্ণধার হলেন তাঁর পরিচয় এর পরের কবিতাতেই পাওয়া যায়। 'ছবি' কবিতাটী রবীন্দ্রনাথ এর কিছুদিন পরেই লেখেন। মিঃ এণ্ড্রুজ্‌ কবির জীবনের এই সময়ের একটী ঘটনা বহুদিন আগে কাগজে লিখেছিলেন। এই কালের কবিতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বোঝার পক্ষে এই ঘটনাটীর মূল্য আমি অনেকখানি দিয়ে থাকি। এই সময়েই য়ুরোপের যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয় এবং কবি এর আগে হ'তেই মানুষের ভাবী অকল্যাণের চিন্তায় ম্রিয়মাণ ছিলেন। 'খেয়া'র রচনাকালে যে বিপদের সুরটীর অতি ক্ষীণ অস্তিত্ব ছিল, তাই এই সময়ে সম্পূর্ণ-মূর্ত্তি গ্রহণ করল। কবির দুঃখ যা ছিল, ভাবলোকে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল কল্পনা ও চিন্তার বিচ্ছুরণে,—'বলাকা'র পরবর্ত্তী রচনায় কবি যে বিশেষ টাইপের সৃষ্টি করলেন, তারই জন্ম হ'ল এইখানে।

বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনেও কবির নব-মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। এখন আর 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেমে'র বন্দনা-গান নয়, নিরুদ্দেশের পথে বিলাসযাত্রাও নয়, 'নববর্ষা'র ও 'কৃষ্ণকলি'র 'আবির্ভাবের' অভিষেক নয়, 'সব পেয়েছির দেশে'ও কবি একবার পলাতক বালকের মত ছুটে যেতে চাননি, এখন তাঁর বিষয়বস্তু 'গতিহীন, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক 'ছবি'; এখন তাঁর কবি-প্রতিভা 'বিচার' ও 'বিতর্কের' দ্বারা আলোড়িত। এই জন্যই দেখি কবি যখনই মাঝে মাঝে কল্পনায় সম্মুখের বস্তুময়ী ধরণীকে অতিক্রম ক'রে উধাও হবার চেষ্টা করেছেন—যেমন 'ছবি'কে সম্বোধন ক'রে তিনি এক জায়গায় বলছেন,

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও,
পথিকের সঙ্গ লও।
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রি দিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এতো দূরে,
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে ? (ছবি—বলাকা

তখনই, তাঁর এই পলাতকা কল্পনা হৃদয়ের দুঃখের গভীরতায় চাপা প'ড়েছে; যা ছিল নিছক কল্প-বস্তু তা'ই আবার ভাবের ও দর্শনের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। কবি নিজের এই উদ্দাম কল্পনার আবেগে লজ্জিত হয়েই যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন, এবং তাঁর বিষয়-বস্তুর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত একটী ঘটনাকে টেনে আন্‌লেন। তিনি এর পরেই লিখ্‌লেন,

'এই ধূ'লি
ধূ'সর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে' ইত্যাদি।

এখানে ধূলির উল্লেখ যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক তা নয়, অপ্রত্যাশিতও বটে। কবি সমস্ত কবিতাটীকে প্রথমে যে মূর্ত্তি দিতে চেয়েছিলেন, সহসা মধ্য-পথে সে ইচ্ছা তাঁর পরিবর্ত্তিত হ'ল, কেননা আপনার উদ্দাম খেয়ালে আপনার খুশীতে রচনা ক'রে যাওয়া এখন আর তাঁর আসে না। যে নাবিক একদিন গহন রাত্রিকালে তাঁর জীবনতরীর কর্ণধার হ'য়েছে তারই ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় নিজেকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রতি পদে তাঁকে করতে হয়; আজ তাঁর কল্পনার চরণে বেদনার জিঞ্জীর, তাঁর চিন্তার চারিপাশে উদ্দেশ্য ও আদর্শের গণ্ডী। এই জন্যই

যখনই মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য 'ক্ষণিকা'র বিদ্যুৎ কল্পনায় ঝল্‌সিয়ে উঠেছে, অমনি কবি সন্ত্রস্ত হ'য়েছেন, তাঁর কল্পনাকে একটী বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে নিবদ্ধ করেছেন, চিন্তাকে দর্শনের ভাববাদে সংকীর্ণ করেছেন।

আমি কি বল্‌তে চেয়েছি তা স্পষ্ট করার জন্য আরো একটী উদাহরণ এখানে দেব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত স্বচ্ছ, কত স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল ছিল, 'ক্ষণিকা'র 'অনবসর' কবিতাটীর সঙ্গে বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাটীর তুলনা করলেই বোধগম্য হবে। 'ক্ষণিকা'য় কবির মন কোনো ভাবের দ্বারাই আক্রান্ত ছিল না, তাই প্রথম উৎসারিত ঝর্ণার মত তাঁর কবিতা যেন বেরিয়ে এ'সেছিল, এবং তাই তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাইতে পেরেছিলেন,

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী,
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি—
নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই।
হায় রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই, সময় যে নেই! (অনবসর—ক্ষণিকা)

কিন্তু 'বলাকা'য় এই তাৎপর্য্যেরই কত বাদশাহী আমেজ, কত আভিজাত্য ও গভীরতা!

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

এবং আবার

উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়া'য় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল
দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল।

'ক্ষণিকা'য় যে চঞ্চলা ছিল কলভাষিণী মর্ম্মর-গান-মুখরিতা, 'বলাকা'য় সেই হয়ে উঠেছে ভাবে, বচনে ও সংযমে অতিমাত্রায় ঐশ্বর্য্যশালিনী। মনে হয় কবি বিরাট নদীর অবিরাম গতির কথা এখানে ভুলে গেছেন, অবিচ্ছিন্ন অবিরল তার যে ক্লান্তিহীন চঞ্চল কলনাদ, তাকে ভাষায় সঙ্গীতে ধরবার চেষ্টা কবি এখানে করেন নি। এর বস্তুময় যে অস্তিত্ব তাকেই কবি বড় ক'রে ধর্‌তে চেয়েছেন, এই জন্যই 'চঞ্চলা' কবির মনে অচঞ্চল সত্য-দর্শনের কথা জাগিয়েছে, কবি তাই নদীর কায়াহীন বেগ প্রত্যক্ষ করলেন,

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে।

এবং তাঁর কল্পনা ক্রমশঃ এই চিন্তার পথ ধ'রে আরও দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হ'ল।

'ক্ষণিকা'র এবং এই যুগের কাব্য-রীতি হ'তে যে 'বলাকা'র রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা প্রথমেই আমাদের চোখে প'ড়েছে। এ প্রণালী উন্নততর কিনা তার আলোচনা এখানে করা চলে না, তবে এ যে [illegible], এ স্বাতন্ত্র্যের যে বিশেষ একটী রূপ আছে তাতে আর সন্দেহ

থাকল না। 'ক্ষণিকা'য় সময় নেই ব'লে বিলাপ ক'রে কবি গেয়েছিলেন—"সময় যে নেই,—সময় যে নেই!" কিন্তু শাজাহানে যখন পড়ি 'নাই, নাই, নাই যে সময়' তখন কেবল যে কতকগুলো শব্দের ব্যবস্থাপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি তা নয়, সমস্ত toneএ ভাবে আদর্শে এক নবতর কাব্যের সন্ধান পাই; কবির কল্পনার এক সম্পূর্ণ নূতন দিকের পরিচয় লাভ করি। এই জন্যই 'বলাকা'র যুগে কবিতা যে কেবল শব্দ-সম্পদে সুপ্রচুর ও ঝঙ্কারময়ী হয়েছে তা নয়, এই সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীরও সজ্জাপরিবর্ত্তন হয়েছে, কবিও বৃদ্ধ হ'য়েছেন।

কিন্তু তা হ'লেও কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম এ-কথা বলতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও দার্শনিক নন, তিনি মানুষের অনন্ত বিস্ময়। তাঁর সম্বন্ধে শেষ-কথা কেউ বলতে পারেনা। যখনই কোনো একটা দিক বিশেষভাবে তাঁর চিন্তায় ও রচনায় প্রবল হ'য়ে উঠছে তখনই তাঁর কবি-বুদ্ধি এই নিয়মের শৃঙ্খল থেকে স্বাভাবিক প্রেরণাতেই মুক্ত হতে চায়। যখনই দেখা গেল, 'বলাকা'র যুগের সমস্ত কবিতায় একটা সুর বিশেষভাবে uniform হ'য়ে উঠছে তখনই এ'ল বিস্ময়ের পর বিস্ময়,—'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ'। অনেকে মনে করেন এই কবিতাগুলি, গভীর বেদনার অনুভূতির পরে যে অবসাদ মানুষের মনে প্রবল হয়, রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তারই চিহ্ন। কিন্তু একটু বিচারদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, 'বলাকা'র ভাববাদের সুর এই কবিতাগুলিতেও প্রচ্ছন্ন আছে। বস্তুতঃ 'বলাকা'র যে কেন্দ্রগত মর্ম্মকথা, তার প্রকাশ যে একই পথে হবে এমন কোনো বিধান থাকতে পারে না। জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা নুড়ি নিয়ে যে খেলা জুমিয়েছে কবি কেবল তার বাহ্য-রূপের পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি

বৃদ্ধ-বালক বেশে এই খেলায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু 'বলাকা'র প্রারম্ভে যে ধ্যানদৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে, তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগও করতে পারেননি। শিশু ভোলানাথের ছদ্মবেশে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেই প্রত্যক্ষ করি, যদিও এখানে দর্শন-তত্ত্ব বালকের খেলার আমোদে অনেকখানি হাল্‌কা ও সহজ হ'য়ে উঠেছে, এবং কবির কল্পনা মাঝে মাঝে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এ ছদ্মবেশ শীঘ্রই অশোভন হ'য়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অপরূপত্ব আবার নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এবং কবি বহুদিন আগে যে রাগিণী পথপ্রান্তে ত্যাগ ক'রে এ'সেছেন, তারই জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে তাঁর নবগৃহীত মন্ত্রের সাধনায় আপনাকে নিযুক্ত করেন। 'পূরবী'তেও 'বলাকা'র ধ্বনিই শুন্‌তে পাই, তেমনি কল্পনার সুদূর-প্রসারী অভিযান, গভীরতা ও স্থবিরতা। মাঝে মাঝে 'লীলাসঙ্গিনী'র স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল ক'রেছে, গগন-ভরা তারার মাঝে তাঁর একান্ত আপনার তারাটীর সন্ধানে তাঁর নয়ন আকাশের কিনারা খুঁজে ম'রেছে, কিন্তু যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি আজ আর কবির কাছে সত্য নয়, ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র, এর যে বেদনা তা কবির কল্পনায় একাকার হ'য়ে গেছে, কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দ্বারা এ আর বিশিষ্ট নয়। সেই জন্যই কবি বলেছেন,

—নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্ত ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে। (তপোভঙ্গ—পূরবী)

এই জন্যই তাঁর লীলাসঙ্গিনী, যাঁকে খেয়াঘাটে ফেলে এসেছিলেন

কবি, তার সঙ্গে চেনা তাঁর হ'ল বিস্মরণের গোধূলিক্ষণে, সন্ধ্যার আবছায়ায়, কাজের কক্ষকোণে। মানসপ্রতিমাগুলিকে আভরণে সাজাবার জন্য সে উদ্দীপনা সে উৎসাহ, সে-নেশা কবির আর নেই; তাই আজীবনের লীলাসঙ্গিনীর কাছে তাঁর বিদায় প্রার্থনা এত করুণ, এত নির্ম্মম—

এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে দিনের সেই বাঁশী।
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ উঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়
সারা হ'য়ে এ'লো দিন। (লীলাসঙ্গিনী—পূরবী)

'প্রবাহিনীতে'ও এই সুর অক্ষুন্ন রয়েছে। 'মহুয়া'য় কবি কোনো নূতন যুগের সূচনা করেননি, 'বলাকা'র ধারাই অব্যাহত রেখেছেন। যে অন্ধকার বিদীরণ ক'রে জ্যোতির্ম্ময় নব-সূর্য্যকে আবাহন ক'রেছিলেন 'বলাকা'র প্রারম্ভে 'মহুয়া'তেও তারই প্রেরণা প্রবাহিত হচ্ছে,

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতনবনের ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকিরআলো জ্বলে।

এই তিমির নিদারুণ আলোকের বন্দনাতেই তাঁর কাব্যচেষ্টায় উল্লসিত, মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হেনে' ঘন অশ্রুবাষ্পেভরা মিথ্যার অন্ধকার মোচন করার জন্য সবিতৃ-দেবতার কাছে তাঁর এই ছিল একান্ত নিবেদন এবং এইজন্যই 'পূরবী'তে এই প্রাথনা ছিল—

ফেলো, ফেলো টুটি
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি। (সাবিত্রী—

'মহুয়া'তেও এই প্রার্থনাই কত রূপে ও বিভিন্ন গানে ধ্বনিত হয়েছে তার অন্ত নেই। 'প্রকাশ' কবিতাটীতে এই প্রার্থনারই রেশ শুন্‌তে পাই, এই ইচ্ছারই বিদ্যুচ্ছটা দেখ্‌তে পাই। যেমন,

শুধু আসি অংশ জনতার
উদ্ধার করিয়া আনো
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো। (প্রকাশ—মহুয়া)

কিন্তু চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর, যা একদিন পূরবীতে বার বার কাজের কক্ষকোণে কবিকে বিভ্রান্ত ক'রে দিত, চঞ্চল ক'রে তুলত, 'মহুয়াতে'ও তা'ই কবিকে বার বার উন্মনা ক'রেছে। কবি মহুয়াতেও এই জন্য লিখেছেন,

যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে ? (পুরাতন—মহুয়া)

কিন্তু হায়, এ গান রবীন্দ্রনাথের শেষ রাগিণীতেও ধ্বনিত হবে, শেষের কবিতাতেও বারবার বেজে উঠবে, কেন না সমগ্র রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁর দুইটী স্বরূপের, কবি ও দার্শনিকের দ্বন্দ্ব মাত্র। উভয়ের মধ্যে অবিশ্রাম যে কলহ ও মিল তারই ফল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও কবিতা, কাজেই সে কথা আমাদের কিছুতেই ভুল্‌লে চল্‌বে না।

এখন 'বলাকা' থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে noteটি আমরা 'মহুয়া' পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলাম, তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সরাসরি একটী জবাব অবশ্য দেওয়া যায়। এ নির্দ্ধারণের পরিপূর্ণ সত্যতা যে স্বীকার করা যায় না, প্রথমেই সে কথা বলেছি, তা হ'লেও 'বলাকা'র যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের দার্শনিক যুগ, একালে রবীন্দ্র-কাব্যে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই যুগে philosophical বলায় যে কেবল একথা বলতে চেয়েছি যে, এ

কালের লেখা লিরিক নয়—শুধু তাই বুঝলেই চলবে না, রবীন্দ্রনাথের philosophyরও একটা বিশেষ ধরণ আছে; আমরা দার্শনিক বলতে চোখে ঠুলি-আঁটা যে বিজ্ঞ লোকটার মূর্ত্তি কল্পনা করি, অথবা পৃথিবীর রহস্যের ইতিবৃত্ত ও অর্থ সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞানের বাহবা দেই এমন কারো কথা ভাবলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। প্রোফেসর রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন যে, রবীন্দ্রদর্শন is a sigh of the soul rather than a reasoned account of metaphysics; an atmosphere rather than a system of philosophy (The Philosophy of Rabindranath Tagore—Macmillan), এবং সত্য সত্য কোনো বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত নৈয়ায়িক বিতর্কপ্রসূত কোনো দর্শন-শাস্ত্রের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রদর্শন আসলে একটা atmosphere এবং একটা মত মাত্র, কোনো বিশেষ একটা প্রণালী নয়। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যে philosophical ব'লেছি তার অর্থও এই সংস্কার আলোকেই বিচার করতে হবে। 'বলাকা'র যুগের কবিতা ভাব-প্রধান, গীতি-প্রধান নয়, philosophical বলতে এই কথাই বুঝতে হবে। এবং এখানে আমরা এই জিনিষটাই বরাবর trace করবার চেষ্টা ক'রেছি এবং দেখাতে চেয়েছি যে, রস ও কাব্যের বিচারে 'বলাকা'র পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ কবিতাই যাকে আমরা খাঁটী কবিতা বলি তা নয়। হয়, এগুলি কবিতার চাইতেও বেশী এমন কিছু অথবা কবিতার চাইতে কম এমন কোনো সাহিত্য। অবশ্য খাঁটি কবিতা যে কবি এই যুগে লেখেননি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষতম কবিতাবলীর অন্যতম, 'নাম্নী', কল্পনার প্রাচুর্য্যে ছন্দের লীলা ও রসের উপা[illegible] অনবদ্য ও অতুলনীয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও কবির এযুগের [illegible]

এমন একটী strain আছে যাকে সংজ্ঞা দিতে যেয়ে দার্শনিক বলা চলে। এ সুর সহজিয়া কবির নয়, এ-সুর যেন কতকটা মিল্টনিক, গম্ভীর ও উদাত্ত। এর শব্দ যেন বাঁশীর রন্ধ্রে নয়, এ যেন একটী organ voice। আমি এই কালের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে স্থানান্তরে বলেছিলাম যে, 'it is the rumbling voice of the sea summoning the mountains' এবং আমার মনে হয় যে একথা বোধ হয় অনেকখানি সত্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এ কালটীর এ-পরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুষ্ঠু না হ'লেও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে সুবিচার-সম্পন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক কথায় ভাল বা মন্দ কিছু না ব'লে, আমরা যে আলোচনা ক'রেছি, তা' থেকে এই একটী জিনিষ অনায়াসেই অনুমান করতে পারি যে, এ-কালের কবিতার জটিলতা বেশী, বৈচিত্র্য আরও বেশী এবং বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য অনেকখানি। সহজ সত্যের এমন একটা অক্ষয় রূপ আছে যার মলিনতা কোনদিনই ঘটে না, যাকে কোনদিনই ছোট করা যায় না। সত্যের বিচিত্র প্রকাশ অবশ্য অনিবার্য্য, কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী যদি জটিল হয়, যদি বিশেষ ক'রে মস্তিষ্ক-সঞ্জাত হয়, তা হ'লে রসের বিচারে তাকে সাহিত্যে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। কেননা, যা গ্রন্থিযুক্ত, যা বিবিধ, যা বহুবিধ তাকে মুক্ত করায় ও ঐক্যদানেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব, তাই কবি অনন্যসাধারণ। আমরা সাধারণ জীবনে সত্যের সরল রূপকে বক্রভাবে দেখতে অভ্যস্ত ব'লেই কবি ও সাহিত্যিকের বিশেষ দৃষ্টিটী আমাদের এমন অভিভূত করে। রবীন্দ্রনাথ এই কালটীতে এই সরল দৃষ্টিটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর গানের সুরটী খোয়া গেছে। এই জন্যই তাঁর কাব্য-রচনায় গানের এত গমক বেশী, সুরের চাইতে কথা এত অধিক। ব্রহ্মে শক্তির

ANOTHER SUCCESSFUL YEAR
OF THE
SWADESHI BIMA CO., LTD.
Head Office : AGRA .
A THOROUGHLY NATIONAL & PROGRESSIVE LIFE OFFICE